Approved by the Text Book Committee and prescribed by the Director of Public Instruction, West Bengal, Vide Notification No. 23 T-B dated 1st, December, 1950

প্রকৃতি-পরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ

(পঞ্চম ও যষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্-বিদ্যার অধ্যাপক,
টিচারস্ ট্রেণিং ক্লাসের অধ্যাপক,
ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

ডাঃ শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন সরকার, এম্, এস্-সি.
পি. এচ্. ডি. (লণ্ডন), ডি. আই. সি. (লণ্ডন)

ও

'সরল বিজ্ঞান পাঠ', 'বিজ্ঞান মুকুল', 'প্রবেশিকা ভূগোল' প্রণেতা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সিংহ, এম্. এস্-সি.

সায়েন্স কলেজের ভূতপূর্ব্ব স্যার রাসবিহারী ঘোষ রিসার্চ্চ স্কলার।

কমলা বুক ডিপো
১৫ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

পদার্থ-বিদ্যা

রসায়ন-বিদ্যা

উদ্ভিদ্-বিদ্যা

প্রাণি-বিদ্যা

উপক্রমণিকা

3786

বর্ত্তমান যুগকে **বিজ্ঞানের যুগ** বলে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। আমরা জলপথে জাহাজে, আকাশ পথে **বিমানে**, স্থলপথে **মটর গাড়ীতে, রেল গাড়ীভে** অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে দূরদেশে যাতায়াত করিতেছি। ইহাতে একদিকে দেশভ্রমণের অপার আনন্দ উপভোগ করি, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করি। আমরা বড় বড় নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতেছি। নানা **অস্ত্র** আবিষ্কার করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতেছি। ঘরে বসিয়া **রেডিওতে** বহু দূরদেশের সংবাদ পাইতেছি। **গ্রামোফোনে** মৃত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত করিতেছি। বিদ্যুতের সাহায্যে আমরা **কল-কারখানা** চালাইতেছি, পাখার বাতাসে শরীর শীতল করিতেছি, ঘরবাড়ী আলোকিত করিতেছি। নানা প্রকার অভিনব **যন্ত্রপাতির ও ঔষধের** সাহায্যে চিকিৎসক আমাদিগকে রোগমুক্ত করিতেছেন। বিজ্ঞান যে এইরূপ আমাদের কত উপকার করিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বিজ্ঞান শিক্ষার উপায়—বিজ্ঞান শিখিতে হইলে দুইটী বিষয় লক্ষ্য রাখিবে—

(১) প্রত্যেক ঘটনা **ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবে** এবং সেই ঘটনা কেন হইল, তাহা জানিবার চেষ্টা করিবে। আমাদের সম্মুখে অহরহঃ নানা ঘটনা ঘটিতেছে। অধিকাংশ ঘটনা আমরা দেখিয়াও দেখি না।

(২) **হাতে কাজ করিতে শিখিবে**—এই উদ্দেশ্যে আমরা অনেক পরীক্ষা (experiment) এই পুস্তকে দিয়াছি।

শিক্ষক মহাশয়গণ ছাত্রদের সম্মুখে এই পরীক্ষাগুলি করিবেন। নিজ চোখে একবার পরীক্ষা দেখা, পুস্তকে লিখিত বিবরণ দশবার পাঠ করার চেয়েও চিত্তাকর্ষক। বিজ্ঞান শিক্ষার ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

প্রকৃতি-পরিচয়

পদার্থ-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

পদার্থের তিন অবস্থা

তোমরা চারিদিকে নানা পদার্থ দেখিতে পাও। ইহারা কি এক রকম পদার্থ? না। কোনটা ইটের মত শক্ত, কোনটা জলের মত তরল, কোনটা বাতাসের মত স্বচ্ছ। এই সকল পদার্থকে তিন অবস্থায় দেখা যায়; যথা ঃ—

(১) **কঠিন** (Solid)—ইট, কাঠ, টেবিল, চেয়ার, বরফ ইত্যাদি।

(২) **তরল** (Liquid)—জল, রক্ত, দুধ, তেল ইত্যাদি।

(৩) **গ্যাসীয়** (Gaseous)—বাতাস, বাষ্প, ধোঁয়া, অম্লজান ইত্যাদি।

কোন পদার্থের একটি অবস্থা নির্দ্দিষ্ট থাকে না। জল সাধারণ উষ্ণতায় তরল থাকে, খুব শীতে জল জমিয়া কঠিন বরফ হয়, আবার জল তাপে বাষ্পীভূত হইয়া বাতাসে মিশিয়া

থাকে। পৃথিবীর যাবতীয় জড় পদার্থকে এই তিন অবস্থার যে কোন অবস্থায় দেখা যায়।

কঠিন পদার্থের ধর্ম্ম—পরীক্ষা বা হাতের কাজ— টেবিলের উপর একখানি ইট রাখ। দেখ, ইহার আটটি কোণ-বিশিষ্ট একটি নির্দ্দিষ্ট আকার আছে। বিনা শক্তি প্রয়োগে তুমি ইহাকে গোল বা লম্বা করিতে পার না। ইহাকে মাপিয়া দেখ; মনে কর উহা ৫ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া ও ২ ইঞ্চি উঁচু। এই মাপের স্থান হইল ইটের আয়তন। পদার্থ যেটুকু স্থান দখল করে তাহাই পদার্থের আয়তন। ইটখানির এই আয়তন নির্দ্দিষ্ট।

এইবার ইটখানিকে তুলিয়া একটি বালতির মধ্যে রাখ; পরে মেঝেতে রাখ। ইহার আকারও নষ্ট হয় না কিংবা ইহা বালতি বা মেঝেতে ছড়াইয়া পড়ে না।

১ নং চিত্র—বিভিন্ন আকারের কঠিন পদার্থ
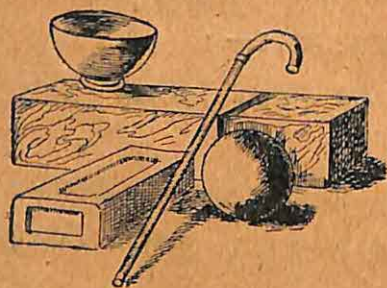
এইরূপ প্রত্যেক কঠিন পদার্থে একটি নির্দ্দিষ্ট আকার ও আয়তন দেখিবে। গ্লাস লম্বা ও গোল, থালা চ্যাপ্টা ও গোল, শ্লেট চতুষ্কোণ। ইহারা প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা দখল করে। ইহাদিগকে রাখিয়া দিলে স্বভাবতঃ চিরকাল এইরূপই থাকে। গ্লাস, ঘটি,

বাটি, ইট ধরিয়া তোল, মাটিতে গড়াইয়া দাও। ইহাদের আকার বদলায় না বা ইহারা বেশী বা অল্প স্থান দখল করে না।

মনে রাখিও বেশী শক্তি প্রয়োগ করিলে ইহাদের আকার ও আয়তন বদলাইয়া যায়। ইট ভাঙ্গিলে, কাট কাটিলে, গ্লাস গলাইয়া ফেলিলে ইহাদের আকার ও আয়তন পৃথক হইয়া যায়।

কঠিন পদার্থ শক্ত ঃ সেইজন্য ইহাদিগের বাধা দেওয়ার শক্তি বেশী। ইহাদের উপর সহজেই আঁচড় কাটা যায়। ইহাদিগকে হাতে করিয়া এক জায়গা হইতে অন্যত্র লওয়া যায়। **কঠিন পদার্থ রাখিতে হইলে কোন পাত্রের দরকার হয় না** কারণ ইহারা ছড়াইয়া পড়ে না; এক জায়গায় গাদা হইয়া থাকে।

তরল পদার্থের ধর্ম্ম—তরল পদার্থ শক্ত নয়। ইহারা এক জায়গায় গাদা হইয়া থাকে না; নীচের দিকে গড়াইয়া যায়। **সেইজন্য তরল পদার্থ রাখিতে হইলে পাত্রের দরকার হয়।** ঘটি, বাটি, গ্লাস ছাড়া জল বা দুধ রাখা যায় না বা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় লওয়া যায় না। হাতে এক মুঠা চাউল ধরা যায় কিন্তু মুঠার মধ্যে দুধ বা জল ধরা যায় না। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া জল বাহির হইয়া যায়; টেবিলের উপর দুধ ঢালিয়া দিলে ইহা টেবিলময় ছড়াইয়া পড়ে।

তরল পদার্থ যখন যে পাত্রে রাখা যায় তখন ইহা সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। আধ সের দুধ গ্লাসে রাখিলে গ্লাসের মত দেখাইবে। সেই দুধ ঢালিয়া বাটিতে রাখিলে

বাটির মত দেখাইবে ; ঘটিতে রাখিলে ঘটির মত দেখাইবে ; চতুষ্কোণ পাত্রে রাখিলে চতুষ্কোণ দেখাইবে। বিনা শক্তি

২ নং চিত্র—এক পরিমাণ জল বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রয়োগেই আকার বদলান যায়। ২নং চিত্রে একই পরিমাণ জল বিভিন্ন আকারের পাত্রে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। লক্ষ্য করিবে সব পাত্রে জলের উপরিভাগ সমতল আছে।

তরল পদার্থ কিন্তু সমস্ত পাত্র ভরিয়া ফেলে না। আধ সের দুধ এক সের পরিমাণ বাটিতে রাখিলে বাটি ভর্ত্তি হয় না। তরল পদার্থের **আয়তন নির্দ্দিষ্ট কিন্তু আকার নির্দ্দিষ্ট নয়।**

তরল পদার্থ শক্ত নয় বলিয়া ইহার বাধা দেওয়ার শক্তি খুব কম। জলের মধ্যে আমরা সহজে নাড়াচড়া করিতে পারি। তরল পদার্থকে সহজেই ভাগ করা যায়। এক কড়া দুধ হইতে এক হাতা দুধ সহজেই লওয়া যায়। শক্ত নয় বলিয়া জলে আঁচড় কাটা যায় না বা জলকে চূর্ণ করা যায় না।

গ্যাসীয় পদার্থের ধর্ম্ম—গ্যাসকে রাখিতে হইলে বদ্ধ পাত্রের দরকার কারণ ইহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। **ইহা পাত্রের আকার ও আয়তন গ্রহণ করে।**

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস যে কোন পাত্রে রাখ, পাত্র যত বড়

হউক না কেন, উহা সম্পূর্ণভাবে পাত্রের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে। উনানের ধোঁয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

পরীক্ষা—আধ সের দুধ একটি বড় কাচপাত্রে (ক) রাখ। ইহা পাত্রে আধ সের মত স্থান দখল করে। পাত্র ছাপাইয়া যায় না বা আপনিই পাত্র হইতে বাহির হইতে পারে না।
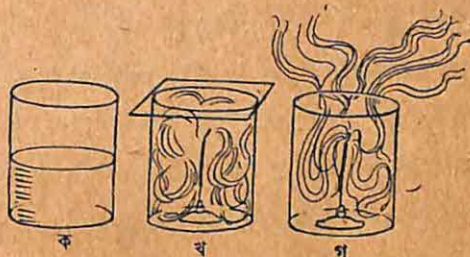
৩ নং চিত্র—ক—দুধের পাত্র, খ—বদ্ধ পাত্র গ—খোলা পাত্র।
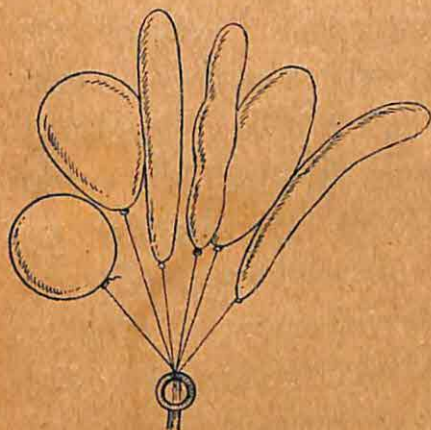
একটি সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়া কাচপাত্রের (খ) মধ্যে ঢাকিয়া রাখ। দেখ ধূপের সাদা ধোঁয়া পাত্রের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ঢাক্‌নি খুলিয়া দাও। দেখ, সাদা ধোঁয়া নিজে নিজেই পাত্র (গ) হইতে বাহির হয় এবং তরল পদার্থের মতন শুধু মাটির উপর না গড়াইয়া চারি দিকে সমস্ত ঘরময় ছড়াইয়া পড়ে। (৩ নং চিত্র গ)।

৪ নং চিত্র—বিভিন্ন আকারের বেলুন

একই পরিমাণ যে কোন গ্যাস বিভিন্ন আকারের ও আয়তনের বেলুনে ভর্তি করিলে উহা বেলুনের আকার ও আয়তন গ্রহণ করে (৪ নং চিত্র)।

কঠিন, তরল ও গ্যাসের উপর চাপের ফল ঃ—

(১) কঠিন পদার্থের উপর চাপ প্রয়োগ করিলে উহার আয়তন বা আকার বদলায় না। ইটের উপর পাঁচ মণ লোহা চাপাও। ইটের আয়তন ছোট হইবে না।

(২) তরল পদার্থের উপর চাপ দিলেও উহার আকার ও আয়তন বিশেষ বদলায় না কিন্তু গ্যাসের উপর সামান্য চাপ দিলে বা চাপ সরাইলে গ্যাসের আয়তন ও আকার বদলাইয়া যায়।

পরীক্ষা—(১) একটি পাত্রে জল লও। একটি পিচকারীর মুখ ঐ জলের মধ্যে রাখিয়া পিচকারীর দণ্ডটি টান। পিচকারীর মধ্যে কিছু জল ঢুকিবে। পিচকারীর মুখ আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিয়া দণ্ডটি ভিতরের দিকে ঠেলিলে উহা একটু নড়িবে না। অর্থাৎ চাপ দিলে পিচকারীর ভিতরের জলের আয়তন কমে না।

৫ নং চিত্র—

পিচকারী

২ পিচকারীর ভিতরের জল ফেলিয়া দিয়া দণ্ডটি বাহিরের দিকে টান। পরে পিচকারীর মুখ বন্ধ করিয়া দণ্ডটি ভিতরের দিকে ঠেল। উহা খানিকটা ভিতরে যাইবে অর্থাৎ চাপ দিলে পিচকারীর ভিতরের বায়ুর আয়তন কমে।

পদার্থের গঠন—প্রত্যেক পদার্থই অংসখ্য অতি সূক্ষ্ম অংশ দিয়া গঠিত। ইহাদিগকে **অনু** (Molecule) বলে। পর পর ইট সাজাইয়া যেমন বাড়ী হয়, পর পর অসংখ্য অণু দিয়া তেমন পদার্থ গঠিত হয়। অণুগুলি এত সূক্ষ্ম যে যন্ত্র দিয়াও ইহাদিগকে দেখা যায় না। এক ফোঁটা জলকে পৃথিবীর মত মনে করিলে অণু হইবে একটি মার্ব্বেলের মত।

কোন পদার্থে অণুগুলি কি করিয়া একসঙ্গে থাকে? চুম্বকের নিকটে লোহাচুর লইয়া গেলে চুম্বক লোহাচুরকে আকর্ষণ করে। উপর হইতে কোন জিনিষ ছাড়িয়া দিলে উহা মাটিতে পড়ে। পৃথিবী ঐ জিনিষকে আকর্ষণ করে বলিয়া উহা পড়িয়া যায়।

৬ নং চিত্র—চুম্বকের লোহাচুর আকর্ষণ

এইরূপভাবে পদার্থের অণুগুলি পরস্পর পরস্পরকে কোন একটা **বলে** (force) আকর্ষণ করে বলিয়া উহারা একসঙ্গে থাকে; কেহ কাহাকে ছাড়িয়া বহুদূর যায় না।

অণুগুলি আকর্ষণ করিলেও উহারা গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকে না। দুইটি অণুর মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ফাঁক থাকে। এই ফাঁক যন্ত্র দিয়াও দেখা যায় না। অনুগুলি স্থির হইয়া থাকে না; এই ফাঁকের মধ্যে ইহারা দ্রুত চলাফেরা করে।

এইরূপ আকর্ষণ না থাকিলে অণুগুলি শূন্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। কোন পদার্থের আকার থাকিত না।

গঠনানুযায়ী তিন অবস্থার কারণঃ—দুইটি বিষয়ের উপর পদার্থের অবস্থার পার্থক্য নির্ভর করে:—(ক) আণবিক আকর্ষণ, (২) অণুর মধ্যস্থিত ফাঁক।

কঠিন পদার্থের অণুগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ খুব বেশী। ইহাদের মধ্যে ফাঁক খুবই কম। ইহাদের নড়াচড়ার শক্তি কম। সেইজন্য ইহারা পরস্পর জোরে আঁকড়াইয়া থাকে, ইহারা শক্ত হয়, ইহাদের আকার ও আয়তন সহজে বদলায় না এবং ইহারা ছড়াইয়া পড়ে না।

তরল পদার্থের আণবিক আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম এবং আণবিক ফাঁক বেশী; অণুগুলি এক জায়গায় গাদা হইয়া থাকে না। ইহাদের স্বাধীন নড়াচড়ার ক্ষমতা বেশী। তরল পদার্থের অণুগুলি পৃথিবীর টানে নীচের দিকে যাইতে চায়। সেইজন্য বাধা না পাইলে তরল পদার্থ গড়াইয়া যায় এবং ইহাদের আকার নির্দ্দিষ্ট থাকে না।

গ্যাসীয় পদার্থে আণবিক আকর্ষণ খুবই কম। ইহাদের অণুগুলির মধ্যস্থিত ফাঁক খুব বেশী। গ্যাসের অণুগুলি পরস্পরের নিকট হইতে দূরে যাইতে চেষ্টা করে এবং যেখানে স্থান পায় সেখানে ছুটিয়া পালায়। সেইজন্য ইহারা আপনা আপনি আয়তন ও আকার বাড়াইতে পারে। অণুগুলির মধ্যে

ফাঁক বেশী থাকে বলিয়া চাপ দিলে উহারা কাছাকাছি আসিয়া পড়ে এবং আয়তন কমিয়া যায়।

৭নং চিত্র—(ক) কঠিন পদার্থ ; (খ) তরল পদার্থ ; (গ) বায়বীয় পদার্থ। ইহাদের অণুগুলির একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক ইহারা এরূপ বড় নয়।

পদার্থের অবস্থান্তর—তাপ প্রয়োগ করিলে অণুগুলির ব্যবধান ও গতি বাড়িয়া যায়। সেইজন্য কঠিন পদার্থে তাপ দিলে তরল এবং তরল পদার্থে তাপ দিলে গ্যাস হয়।

পরীক্ষা—(১) জলের কঠিন রূপ বরফ। একটি পাত্রে **(ক চিত্রে)** এক খণ্ড বরফ রাখ ; দেখ, ইহা শক্ত। ইহার নির্দ্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে। ইহা চৌকোণা, গোলাকার বা অন্য আকারের। ইহাতে তাপ দাও। অণুর গতি বাড়িয়া যায় এবং বরফ তরল রূপ ধারণ করিয়া জল হয়। বরফের

৮নং চিত্র—(ক) বরফ ; (খ) জল ; (গ) বাষ্প।

আকার নষ্ট হইয়া যায়। ইহা পাত্রে ছড়াইয়া পড়ে (খ চিত্রে)।

আরও তাপ দাও, অণুর গতি আরও বাড়িয়া যায় এবং জল বাষ্প হইয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়ে (গ চিত্রে)।

(২) একটি গ্লাসের মধ্যে বরফ রাখিয়া গ্লাসকে বাতাসে রাখ। গ্লাসের বাহিরের গায়ে জল জমে। শীতল গ্লাসের গায়ে লাগিয়া বাতাসের জলীয় বাষ্পের অণুর গতি কমিয়া যায় এবং বাষ্পরাশি তরল জলে পরিণত হয়। জলকে আরও শীতল কর, অণুর চাঞ্চল্য আরও কমিয়া কঠিন বরফ হয়।

তাপে প্রত্যেক পদার্থই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পদার্থ মাত্রেরই ওজন আছে—একখানা বই যত আয়াসে হাতে রাখা যায়, একখানা ইট তত আয়াসে হাতে রাখা যায় না। কারণ বই অপেক্ষা ইট ভারী।

পৃথিবীর সব পদার্থ কম বেশী ভারী হয় বা উহাদের ওজন থাকে। **পৃথিবী নিজেই কেন্দ্রের দিকে সমস্ত পদার্থকে আকর্ষণ করে।** এইজন্য কোন জিনিষ আশ্রয়শূন্য অবস্থায় রাখিলে পড়িয়া যায়। **এই আকর্ষণের জন্যই পদার্থ ভারী হয় বা ইহার ওজন থাকে।** কঠিন পদার্থ ও তরল পদার্থের যে ওজন আছে, তাহা ইহাদিগকে হাতে করিলেই বুঝিতে পার। কিন্তু বায়ু এত হাল্‌কা, উহার যে ওজন আছে তাহা সহজে বুঝা যায় না। নিম্নলিখিত পরীক্ষা করিলে বুঝিবে।

পরীক্ষা—একটি প্যাঁচকলযুক্ত ফ্লাস্ক লও। প্রথমে ফ্লাস্কের বায়ু পাম্পের সাহায্যে বাহির করিয়া লও এবং সঙ্গে সঙ্গে

প্যাঁচকল আঁটিয়া দাও। এখন বাহিরের বাতাস ফ্লাস্কের মধ্যে ঢুকিতে পারে না। ফ্লাস্ককে তুলাদণ্ডে (Balance) ওজন কর। তারপর প্যাঁচ-কল ঘুরাইয়া উহার মধ্যে বায়ু ঢুকাইয়া পুনরায় ওজন কর। এইবার ওজন একটু বাড়িয়া গিয়াছে। বাড়্তি ওজন ফ্লাস্কের ভিতরের বায়ুর ওজন।

৯নং চিত্র—বায়ুর ওজন পরীক্ষা।

সারাংশঃ—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়পদার্থের তুলনা
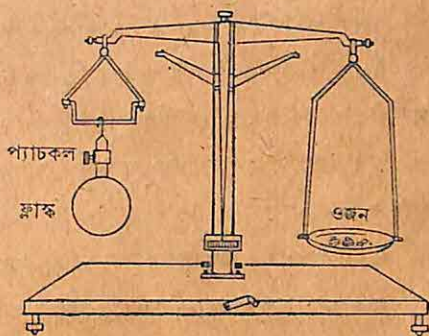
কঠিন	তরল	গ্যাসীয়
১। ওজন আছে।	১। ওজন আছে।	১। ওজন আছে।
২। আয়তন ও আকৃতি সহজে পরিবর্ত্তন হয় না।	২। আয়তন নির্দ্দিষ্ট কিন্তু পাত্রের আকার ধারণ করে।	২। পাত্রের আকার ও আয়তন ধারণ করে।
৩। কোন দিকেই ছড়াইয়া পড়ে না।	৩। নীচের দিকে গড়াইয়া পড়ে।	৩। চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।
৪। চাপ দিলে আয়তন কমে না।	৪। চাপ দিলে আয়তনে বিশেষ কমে না।	৪। সামান্য চাপেই আয়তন কমে।

প্রশ্ন

১। পদার্থ কি দিয়া ও কি ভাবে গঠিত হয় ?

২। পদার্থের তিনটি অবস্থা কি কি ? ইহাদের পার্থক্য কি কি ? গ্যাসীয় পদার্থ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে কেন ?

৩। গ্যাসীয় পদার্থের যে ওজন আছে, তাহা কি করিয়া বুঝিতে পার ?

৪। পদার্থের অবস্থান্তর কি করিয়া হয় ?

৫। পদার্থের গঠন সম্বন্ধে কি জান ? অণু কাহাকে বলে। পদার্থের অণুগুলি কি কারণে এক জায়গায় থাকে ?

হাতের কাজ—নিজ হাতে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর :—

গ্যাসের উপর চাপ দিলে আয়তন কমে ; গ্যাস সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে ; তরল পদার্থের আকার নির্দ্দিষ্ট নয়। গ্যাসের আকার ও আয়তন নির্দ্দিষ্ট নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাপ

তাপের উপকারিতা—তাপের উপর আমাদের জীবন-ধারণ নির্ভর করে। সূর্য্যের তাপে নদ-নদী ও সমুদ্রের জল বাষ্প হইতেছে। সেই বাষ্প জমিয়া বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টিতে শস্য জন্মায়। সূর্য্যতাপে পৃথিবী গরম থাকে এবং প্রাণীর বাসের উপযুক্ত হয়।

কাঠ ও কয়লার তাপে আমরা প্রত্যহ আহার প্রস্তুত করি; জল তাপে বাষ্পীভূত হয়। এই বাষ্পের সাহায্যে আমরা রেল গাড়ী, ষ্টিমার ও কল-কারখানা চালাই।

তাপ কি ?—তাপ এক প্রকার শক্তি। শক্তি দিয়া আমরা কাজ করি। তাপ দিয়া আমরা রেল, ষ্টিমার ও কল-কারখানা চালাই।

কোন পদার্থের অণুগুলি বেশী কাঁপিতে থাকিলে অণুগুলির গতির জন্য তাহাতে তাপ উৎপন্ন হয়। শীতল পদার্থের অণু-গুলি কম কাঁপে।

তাপ চলাচল—জল সর্ব্বদা উঁচু স্থান হইতে নীচু স্থানে গড়াইয়া যায়। বৃষ্টির সময় ছাদ বা চাল হইতে জল গড়াইয়া মাটিতে পড়ে। এইরূপ তাপও গরম পদার্থ হইতে ঠাণ্ডা পদার্থে প্রবাহিত হয়। একটি লোহার হাতার এক দিক্ স্পর্শ

করিয়া অপর দিক্ উনানের আগুনের মধ্যে রাখিলে তাপ হাতার মধ্য দিয়া হাতে পৌঁছায় ; হাতে গরম লাগে।

পরীক্ষা—দুইটি তামার বল লও। একটিকে গরম কর। গরম বলকে ঠাণ্ডা বলের গায়ে ঠেকাইয়া রাখ। কিছুক্ষণ পর উভয়কে স্পর্শ করিয়া দেখ। গরম বল ঠাণ্ডা হইয়াছে ; ঠাণ্ডা বল গরম হইয়াছে। উভয়েরই সমান উষ্ণতা হইয়াছে। অতএব দেখা যায় **তাপ গরম পদার্থ হইতে ঠাণ্ডা পদার্থে প্রবাহিত হয় যতক্ষণ না উহাদের উষ্ণতা এক হয়।**

১০নং চিত্র—তাপ উষ্ণ পদার্থ হইতে শীতল পদার্থে যায়।

তাপের ফল—তাপ দিলে অণুগুলির গতি বাড়িয়া যায়। ইহারা বেশী জায়গা জুড়িয়া নড়াচড়া করে। ইহার ফলে **(১) পদার্থ আয়তনে বাড়ে, (২) সঙ্গে সঙ্গে ইহার উষ্ণতাও বাড়ে, (৩) অধিক তাপ দিলে ইহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়।**

কঠিন পদার্থের বিস্তৃতি—**কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে ইহা আয়তনে বাড়ে এবং শীতল করিলে আয়তনে কমে।**

পরীক্ষা—একটি পিতলের ছোট বল ও একটি আংটা লও। বলটি সাধারণ উষ্ণতায় আংটার মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতে পারে। বলটি আগুনে উত্তপ্ত কর। উহার আয়তন বাড়িয়া গেল। উহা আংটার মধ্য দিয়া গলিয়া যায় না, আটকাইয়া

থাকে। এই অবস্থায় বলটির উপর জল ঢালিলে উহা আয়তনে কমে এবং সহজেই আংটার মধ্য দিয়া গলিয়া যায়।

মনে রাখিবে, সকল কঠিন পদার্থ একই তাপে সমানভাবে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয় না। সীসার প্রসারণের মাত্রা লোহার চেয়ে বেশী।

১১নং চিত্র—আংটা ও বল।

প্রসারণ ও সঙ্কোচনের উপকারিতা—(১) রেল লাইনে দুইটী জোড়ের মুখে একটু ফাঁক (ক) রাখা হয়। সূর্য্যতাপে এবং দ্রুতগতি চাকার ঘর্ষণে লোহার রেল গরম হয় এবং দৈর্ঘ্যে বাড়িয়া যায়। জোড়ের মুখে ফাঁক না থাকিলে, আয়তনে বাড়িয়া গিয়া রেলগুলি পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া বাঁকিয়া যাইত; ট্রেণ পড়িয়া যাইত।
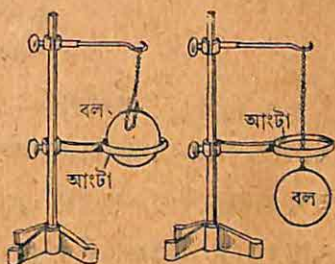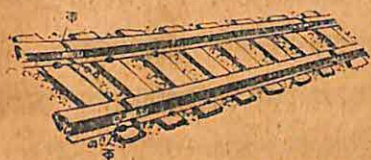
১২নং চিত্র—রেললাইনের ফাঁক (ক)

(২) গরুর গাড়ীর কাঠের চাকায় লোহার বেড় বা হাল (ক) শক্তভাবে লাগান থাকে। হালের পরিধি চাকার পরিধি অপেক্ষা একটু ছোট রাখা হয়। কাজেই সাধারণ উষ্ণতায় হালটি চাকার গায়ে লাগান যায় না। হালকে প্রথমে ঘুঁটে বা কয়লার আগুনে খুব গরম করিয়া লওয়া হয় (খ)। ইহাতে

হালের আয়তন বাড়িয়া যায়। তখন উহাকে চিম্‌টা দিয়া
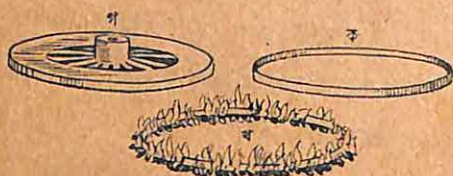
১৩নং চিত্র—চাকার হাল লাগান।

চাকার গায়ে লাগাইয়া ততক্ষণাৎ জল ঢালিলে উহা বেশ শীতল হয়, আয়তনে কমিয়া যায় এবং চাকার গায়ে শক্তভাবে আঁটিয়া যায় (গ)। (১৩নং চিত্র)

(৩) শিশির মুখে কাচের ছিপি আঁটিয়া যাইলে শিশির মুখ গরম করিতে হয়। ইহাতে শিশির মুখ গরম হইয়া একটু বড় হয়, কিন্তু ভিতরের ছিপি ততটা গরম হয় না কাজেই আয়তনে প্রায় একই থাকে; সুতরাং ছিপি খুলিয়া যায়।

(৪) উত্তপ্ত চিম্‌নির গায়ে হঠাৎ জল ফেলিলে সেই অংশ আয়তনে কমিয়া যায়। অন্য অংশ গরমে প্রসারিত থাকে। সেইজন্য উহা ফাটিয়া যায়।

(৫) ঘরের কড়ির পাশের গাঁথুনিতে একটু ফাঁক রাখা হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে অধিক রৌদ্রে কড়ি বাড়িয়া এই পাশের ফাঁকা স্থান দখল করে বলিয়া দেওয়াল ফাটিয়া যায় না।

তরল পদার্থের বিস্তৃতি—তরল পদার্থও কঠিন পদার্থের ন্যায় তাপে প্রসারিত হয় এবং ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়। তবে তরল পদার্থের প্রসারণের মাত্রা কঠিন পদার্থের চেয়ে বেশী।

পরীক্ষা—একটি কাচের ফ্লাস্কের মুখে কর্কের সাহায্যে একটি লম্বা নল লাগাও; ফ্লাস্কটি তুঁতে গোলা নীল জলে এমনভাবে পূর্ণ কর, যাহাতে জল নলের মধ্যভাগে **খ** স্থানে থাকে। ফ্লাস্ককে ধীরে ধীরে গরম কর। তাপ প্রথমে ফ্লাস্কের কাচকে গরম করে সেইজন্য প্রথমে ফ্লাস্কটি আয়তনে সামান্য একটু বাড়ে এবং জল **গ**-তে নামিয়া আসে। ইহার পরই তাপে জলের আয়তন বাড়ে; এই জন্য নলের ভিতর দিয়া জল উপর দিকে উঠিয়া যায়। একই তাপের প্রভাবে কঠিন কাচের চেয়ে তরল জলের বিস্তৃতি অনেক বেশী বলিয়া জল **খ** ছাড়াইয়া ক-তে আসিয়া দাঁড়ায়। যদি কাচ ও জল সমান মাত্রায় প্রসারিত হইত তবে জল একই জায়গায় **খ**-তে থাকিত। জলকে শীতল করিলে সঙ্কুচিত হইয়া পূর্ব্বেকার স্থানে ফিরিয়া আসে। তাপ বেশী হইলে জল নল ছাপাইয়া বাহিরে পড়িয়া যায়।
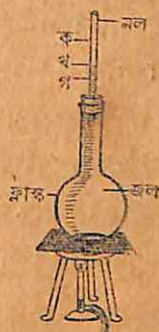
১৪নং চিত্র—তরল পদার্থের বিস্তৃতি পরীক্ষা।

এইরূপ একই মাপের চারিটি ফ্লাস্কের মধ্যে পৃথকভাবে একই পরিমাণ জল **(ক)**, গ্লিসারিণ **(খ)**, তার্পিণ তেল (গ), কোহল (Alcohol) **(ঘ)** রাখ। উহাদিগকে একসঙ্গে একটি গরম জলের পাত্রে ডুবাইয়া পরীক্ষা করিলে
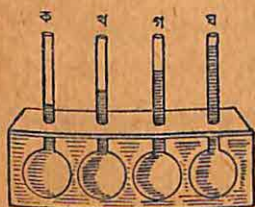
১৫নং চিত্র—বিভিন্ন তরল পদার্থের বিস্তৃত পরীক্ষা।

দেখিবে যে, কোহল, তার্পিন তেল, গ্লিসারিণ, জল ইহাদের মধ্যে পর পর প্রসারণের মাত্রা বেশী হইয়াছে।

প্রত্যেক কঠিন ও তরল পদার্থ তাপ দিলে বাড়ে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির সীমা আছে। সীমা ছাড়াইলে পদার্থের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়।

সারাংশ—(১) তাপ গরম পদার্থ হইতে শীতল পদার্থে চলিয়া যায়। (২) কঠিন পদার্থ তাপে বাড়ে—একটী বল ঠাণ্ডা অবস্থায় একটি আংটার মধ্য দিয়া গলিয়া যায় কিন্তু গরম করিলে উহা গলে না। (৩) তরল পদার্থও তাপে বাড়ে—একটি জলপূর্ণ ফ্লাস্কে একটি নল লাগাও। ফ্লাস্ক গরম কর। নলের ভিতর জল প্রথমে একটু নীচে নামিয়া পড়ে; পরে নল ছাপাইয়া যায়।

প্রশ্ন

১। কেন হয় বল :—

(ক) গরম চিম্নিতে ঠাণ্ডা জল লাগিলে ফাটিয়া যায়।

(খ) লোহার রেলের মধ্যে ফাঁক থাকে।

(গ) ঘরের বড় বড় কড়ির পাশে ফাঁক থাকে।

২। তাপে তরল পদার্থের বিস্তৃতি কি করিয়া দেখাইবে ?

৩। জল, কোহল, গ্লিসারিণ—ইহাদের প্রসারণের মাত্রা কম বেশী কি করিয়া দেখাইবে ?

৪। তাপ কি ? প্রমাণ কর :—তাপ গরম পদার্থ হইতে শীতল পদার্থে প্রবাহিত হয়।

হাতের কাজ—পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর :—(১) তাপে একটি লোহার বল বাড়িয়া যায়। (২) তাপে জলের আয়তন বাড়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

পারদ থার্মোমিটার

উষ্ণতা ও তাপ—উষ্ণতা (temperature) ও তাপ (heat) পৃথক্ ব্যাপার। তাপের চলাচলের অবস্থা যাহা নির্ণয় করে তাহাকে উষ্ণতা বলে। বেশী উষ্ণ পদার্থ হইতে কম উষ্ণ পদার্থে তাপ চলাচল করে। কোন পদার্থ বেশী উষ্ণ হইলেও তাহাতে যে বেশী পরিমাণ তাপ থাকিবেই তাহা নহে।

একটি ছোট লোহার বল যে পরিমাণ তাপে লাল হয়, সেই পরিমাণ তাপ হয়ত এক বাল্‌তি জলকে সামান্য গরম করে। কিন্তু লোহার উত্তপ্ত লাল বলকে বালতির ফুটন্ত জলের মধ্যে ফেলিলে তাপ লোহার বল হইতে জলের মধ্যে যাইবে, কারণ লোহার বলে মোট **তাপ শক্তি** কম থাকিলেও উহার উষ্ণতা বেশী।

উষ্ণতা কি করিয়া মাপা হয়—আমরা কাহারও জ্বর হইয়াছে কিনা রোগীর গা স্পর্শ করিয়া অনুভব করি। কিন্তু ঠিক কত জ্বর হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। দুইটি কারণের জন্য স্পর্শ করিয়া পদার্থের উষ্ণতা বোঝা যায় না ; যথা :—

(১) **পদার্থের তাপ-চলাচল শক্তির তারতম্য**—লোহার কড়াই ও কাঠের চেয়ারে এক সময়ে হাত দিলে চেয়ার

অপেক্ষা কড়াই বেশী শীতল বোধ হইবে ; কারণ দেহ হইতে তাপ কাঠ অপেক্ষা লোহার মধ্য দিয়া দ্রুত চলিয়া যায়।

(২) দেহের অবস্থার তারতম্য

পরীক্ষা—(১) তিনটি পাত্র লও। প্রথমে পাত্রে (ক) উষ্ণ জল, দ্বিতীয় পাত্রে (খ) ঈষদুষ্ণ জল এবং তৃতীয় পাত্রে (গ) বরফ জল রাখ। এখন তোমার বাম হাত বরফ জলে এবং ডান হাত উষ্ণ জলে কিছুক্ষণ রাখিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাতই এক সঙ্গে মধ্যের পাত্রে ডুবাও। ডান হাত শীতল ও বাম হাত উষ্ণ বোধ হইবে যদিও ইহারা একই জলে ডুবান আছে।

১৬নং চিত্র—স্পর্শ দ্বারা উষ্ণতা পরীক্ষা।

তাপ উষ্ণ পদার্থ হইতে শীতল পদার্থে প্রবাহিত হয়। মধ্য পাত্রের জল অপেক্ষা ডান হাত উষ্ণ এবং বাম হাত শীতল থাকে। তাপ ডান হাত হইতে জলে চলিয়া যায়। জল হইতে তাপ বাম হাতে চলিয়া যায়। সুতরাং ডান হাত শীতল এবং বাম হাত উষ্ণ বোধ হয়।

অতএব দেখা যায় যে, **স্পর্শ করিয়া কোন পদার্থের উষ্ণতা সঠিক ধরা যায় না**। এইজন্য কোন পদার্থের উষ্ণতা মাপ করিবার জন্য যন্ত্রের দরকার। এইরূপ যন্ত্রকে **উষ্ণতা-মান যন্ত্র** বা **থার্মোমিটার** (Thermometer) বলে।

তাপে পদার্থের আয়তন বাড়ে। এই আয়তন-বৃদ্ধি দেখিয়া

উষ্ণতা মাপা হয়। কঠিন পদার্থের বিস্তৃতি খুব কম। গ্যাসীয় পদার্থের বিস্তৃতি খুব বেশী। সেই জন্য সাধারণতঃ তরল পদার্থের বিস্তৃতি দ্বারা উষ্ণতা মাপা হয়।

নিম্নলিখিত সুবিধার জন্য উষ্ণতা-মান যন্ত্রে **পারদ** (mercury) ব্যবহৃত হয়; যথা—

(১) অল্প উষ্ণতার জন্য ইহার বিস্তৃতি খুব বেশী।

(২) ইহা খুব বেশী শীতল না হইলে কঠিন হয় না, বা খুব বেশী উত্তপ্ত না হইলে বাষ্পীভূত হয় না।

(৩) ইহার উপরের তল বেশ ভালভাবে দেখা যায়।

(৪) ইহা পাত্রের গায়ে লাগিয়া থাকে না।

(৫) ইহা তাপের সুপরিচালক।

থার্ম্মোমিটার প্রস্তুত প্রণালী—থার্ম্মোমিটার চুলের মত সূক্ষ্ম নালীযুক্ত একটি লম্বা কাচ নল। ইহার একদিকে পারদপূর্ণ একটি বড় খোল বা কুণ্ড (Bulb) থাকে। খোলের পারদ একটু গরম হইলেই উহা সূক্ষ্ম নালী বাহিয়া অনেক দূর বিস্তৃত হইতে পারে। কাচ নলের ছিদ্রের বেড় সর্ব্বত্র সমান হওয়া দরকার। ইহাতে যে কোন উষ্ণতায় পারদ সমভাবে বিস্তৃত হয়।

পরীক্ষা—এইরূপ একটি কাচ নলের এক দিক্ তাপে সামান্য গলাইয়া অপর দিকে মুখ দিয়া ফুঁ দাও এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নলটিকে আস্তে আস্তে ঘুরাইতে থাক; গলিত অংশ

একটু স্ফীত হইবে। এইরূপে কাচ নলের গলিত দিকে একটি খোল (ক) প্রস্তুত কর। (১৭নং চিত্র)

নালী অতি সূক্ষ্ম বলিয়া উহার ভিতর পারদ ঢালা যায় না। কাচ নলের অপর দিকে রবারের নলের (র) সাহায্যে একটি ছোট ফানেল (Funnel) যুক্ত কর। ইহাতে অল্প পারদ ঢালিয়া দাও। এখন খোলকে সামান্য গরম কর। খোলের ভিতরকার বায়ু আয়তনে বাড়িয়া নালীর বাহিরে আসিবে। তাপ বন্ধ কর; খোলের ভিতরকার বায়ু আয়তনে কমিয়া যাইবে; বাহিরের বায়ুর চাপে ফানেলের পারদ কাচ-নলের নালীর ভিতরে ঢুকিবে। এইরূপে কয়েকবার খোলকে ঠাণ্ডা ও গরম করিলে খোল ও নলের খানিকটা অংশ পারদে পূর্ণ হইবে।

ফানেল
র
খ
ক

১৭নং চিত্র—থার্ম্মোমিটার প্রস্তুত প্রণালী।

ফানেল সরাইয়া লও। এখন খোলের পারদকে একটু গরম কর; পারদ বিস্তৃত হইয়া কাচ নলের প্রায় শেষ দিকে পৌঁছিলে কাচ নলের মুখ (খ) গলাইয়া বন্ধ করিয়া দাও। এখন খোল ও কাচ নলের মধ্যে কেবল পারদ ও পারদের বাষ্প থাকে; বায়ু থাকে না।

পরীক্ষা—একটি বড় ফানেলে পরিষ্কার বরফের টুক্‌রা রাখ। বরফের মধ্যে একটি কাচদণ্ড দিয়া একটি গর্ত্ত কর। সেই গর্ত্তের

মধ্যে পারদপূর্ণ কাচ নলের খোলকে (ক) ডুবাইয়া রাখ। কিছুক্ষণ পর দেখিবে যে, পারদ একস্থানে স্থিরভাবে আছে। সেই স্থানে কাচ নলের গায়ে একটি উখো দিয়া দাগ কাট; এই উষ্ণতাকে **হিমাঙ্ক** (Freezing point) বলে। কারণ এই উষ্ণতায় জল জমিয়া বরফ হয়। (১৮নং চিত্র)

পরীক্ষা—একটি ফ্লাস্কের মধ্যে খানিকটা জল লও। ফ্লাস্কের মুখে একটি কর্কের (খ) মধ্য দিয়া পারদপূর্ণ (ক) কাচ নলকে এমনভাবে প্রবেশ করাও যে, ইহার খোলটি জলের একটু উপরে থাকে। (১৮(ক) নং চিত্র)

ফ্লাস্কের জল ফুটাও, তাহা হইতে উষ্ণ বাষ্প উঠিবে। এই বাষ্পের মধ্যে খানিকক্ষণ ঐ কাচ নলকে রাখিলে পারদ এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকে। কাচ নলের সেই অংশে একটি দাগ কাট। এই উষ্ণতাকে **স্ফুটনাঙ্ক** (Boiling point) বলে। কারণ এই উষ্ণতায় জল ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয়।
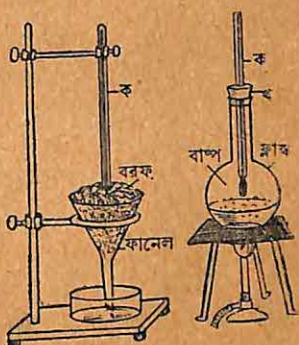
১৮নং চিত্র—হিমাঙ্ক নির্ণয়। ১৮(ক)নং চিত্র—স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়।

প্রথম দাগকে ০ ধরিয়া ও দ্বিতীয় দাগকে ১০০ ধরিয়া মধ্যবর্ত্তী নলের অংশকে এক শত সমান অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশে দাগ কাট। দাগের গায়ে সংখ্যা লেখ। প্রত্যেক অংশকে এক-এক ডিগ্রী বলা হয়। কোন অঙ্কের ডান

পাশে মাথার উপর শূন্য দিয়া ডিগ্রী লেখা হয় ; যথা—১°, ৩°। এইরূপ মাপের থার্মোমিটারকে সেন্টিগ্রেড (Centigrade) থার্মোমিটার বলে।

ফারেন্‌হিট (Fahrenheit) থার্মোমিটারে হিমাঙ্ককে ৩২° ও স্ফুটনাঙ্ককে ২১২° ধরা হয়। এই দুই ভাগের মধ্যবর্তী স্থানকে ১৮০টি সমান অংশে ভাগ করিয়া দাগ কাটা হয়।

১৯নং চিত্র— থার্মোমিটার।

দাগের গায়ে সংখ্যা লেখা থাকে। অতএব দেখা যায় যে, ফারেন্‌হিট মাপ অনুযায়ী জল জমে ৩২° ও জল ফুটে ২১২° উষ্ণতায় এবং সেন্টিগ্রেড মাপ অনুযায়ী জল জমে ০° ও জল ফুটে ১০০° উষ্ণতায়। ১০০° সে = ১৮০° ফাঃ ∴ ১° সেঃ = $(\frac{৯}{৫})^{\circ}$ ফাঃ।

থার্মোমিটারের খোলটি কোন জিনিষের গায়ে কিছুক্ষণ রাখিলে পারদ এক দাগে স্থির হয়। সেই দাগের সংখ্যাই নিজেদের উষ্ণতার (ডিগ্রিতে) মাপ।

জ্বর দেখিবার থার্মোমিটার (Clinical Thermometer)—এই যন্ত্রে ফারেন্‌হিট নিয়মে ৯৫° হইতে ১১০° পর্যান্ত প্রত্যেক ডিগ্রীতে বড় দাগ কাটা থাকে। কারণ জীবিতাবস্থায়

মানুষের দেহের উষ্ণতা এই দুই সীমা কখনই ছাড়াইয়া যায় না। প্রত্যেক দুই বড় দাগের মাঝের অংশকে ৫টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। কাজেই ছোট দাগের এক একটি অংশ ·২ ডিগ্রী। সুস্থ লোকের দেহের উষ্ণতা ৯৮·৪°। এখানে একটি চিহ্ন করা থাকে। দেহের উষ্ণতা এই অঙ্কের কম বা বেশী হইলে বুঝিতে হইবে লোকটি অসুস্থ হইয়াছে।

এই যন্ত্রের খোলের ঠিক উপরেই নলের ছিদ্রটি একটু সরু ও বাঁকা হইয়া গিয়াছে। রোগীর দেহের তাপ বাড়িলে খোলের পারদ প্রসারিত হইয়া ঐ সরু ও বাঁকা অংশ (ক) দিয়া নলের মধ্যে উঠিয়া যায়। কিন্তু রোগীর বগল বা মুখ হইতে থার্ম্মোমিটার বাহির করিবামাত্র বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া পারদ শীতল ও সঙ্কুচিত হইলেও নলের পারদ সরু অংশের মধ্য দিয়া খোলের মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে না। অতএব, দেহের উষ্ণতা দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন হয় না। পুনরায় দেহের উত্তাপ দেখিবার জন্য থার্ম্মোমিটার ঝাড়িয়া খোলের মধ্যে পারদ ঢুকাইয়া দিতে হয়। (২০নং চিত্র)

১১০
১০৫
১০০
৯৫
ক

২০নং চিত্র

সারাংশ—(১) তাপ চলাচলের অবস্থাকে উষ্ণতা বলে। (২) স্পর্শ দ্বারা কোন পদার্থের উষ্ণতা সঠিক বোঝা যায় না। (৩) উষ্ণতা-

মাপক যন্ত্রকে থার্মোমিটার বলে—একটি সূক্ষ্মনালী বিশিষ্ট কাচ নলের একদিক গলাইয়া একটি কুণ্ড প্রস্তুত হয়। ফানেলের সাহায্যে কুণ্ড ও কাচ নলে পারদ ভরা হয়। কুণ্ডকে একবার বরফে ও একবার ফুটন্ত জলের বাষ্পে রাখিয়া উভয় ক্ষেত্রে পারদ স্তম্ভ যেখানে স্থির হয় সেখানে দুইটি দাগ কাটা হয়। ইহাদিগকে যথাক্রমে হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বলে। এই দুই দাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ১০০ ও ১৮০ সমান অংশে বিভক্ত করিলে যথাক্রমে ফারেন্‌হিট ও সেণ্টিগ্রেড থার্মোমিটার হয়। জ্বর দেখিবার থার্মোমিটারে ৯৫°-১১০° পর্য্যন্ত দাগ কাটা থাকে এবং খোলের উপরেই একটি বাঁকা অংশ থাকে।

প্রশ্ন

১। থার্মোমিটারে পারদ কেন ব্যবহৃত হয়?

২। হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কাহাকে বলে? কি করিয়া উহাদের বাহির করিতে হয়?

৩। জ্বর দেখিবার থার্মোমিটারের বিশেষত্ব কি?

৪। থার্মোমিটার কি? ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল বর্ণনা কর। সেণ্টিগ্রেড্ ও ফারেন্‌হিট থার্মোমিটারে পার্থক্য কি?

M. E. 1940

চতুর্থ অধ্যায়

অবস্থার পরিবর্ত্তন

পরীক্ষা—একখণ্ড বরফ একটি থালায় কিছুক্ষণ রাখিয়া দাও। সাধারণ তাপেই উহা গলিয়া জল হয়। এই জলকে একটি কেট্‌লিতে ফুটাও। জল বাষ্প হইরা কেট্‌লির নল দিয়া বাহির হয়। বাষ্পের কাছে একটি শীতল গ্লাস ধর। গ্লাসের গায়ে বাষ্প জমিয়া জল হয়। সেই জলকে আরও শীতল কর, জল কঠিন হইয়া বরফ হয়।

পদার্থের কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থাতে পরিবর্ত্তনকে **গলন** (Fusion) বলে। আর তরল হইতে বাষ্পে পরিবর্ত্তনকে **বাষ্পীভবন** (Evaporation) বলে। বাষ্প হইতে তরল অবস্থাতে পরিবর্ত্তন **ঘনীকরণ** (Condensation) এবং তরল হইতে কঠিন অবস্থাতে পরিবর্ত্তনকে **জমাট বাঁধা** (Solidification) বলে।

গলন—ঘি, মাখন, নারিকেল তেল, সোনা, তামা প্রভৃতি পদার্থ তাপ দিলে গলিয়া যায়। চিঠি আঁটিবার সময় আমরা গালাকে আগুনে ধরিয়া গলাই। স্বর্ণকার প্রথমে সোনা-রূপাকে হাপরের আগুনে গলাইয়া জলের মত তরল করিয়া ফেলে। তারপর সেই সোনা-রূপা দিয়া মাপ ও নক্সা মত গহনা

প্রস্তুত হয়। নারিকেল তেল, ঘি প্রভৃতি শীতে জমিয়া গেলে আমরা রৌদ্রে বা আগুনের তাপে রাখিয়া গলাইয়া লই।

সব জিনিষ একই তাপে গলে না। লৌহ ১১৫০° ডিগ্রীতে গলে; রাং গলে ২৩২° ডিগ্রীতে; মাখন ৩৩° ডিগ্রীতে; বরফ ০° ডিগ্রীতে গলে।

ঘটি, ঘড়া, গহনা বা যে কোন ধাতুর জিনিষ ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা পিতল বা রাং দিয়া ঝালাইয়া লই। ভাঙ্গা জিনিষ যে তাপে গলে, ঝাল তার চেয়ে কম তাপে গলে। সেইজন্য ভাঙ্গা জিনিষটাকে না গলাইয়াও অল্প তাপে ভাঙ্গা জায়গায় ঝাল দিয়া জোড়া লাগান হয়।

কঠিন পদার্থ গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া অনেক নূতন রকমের পদার্থ প্রস্তুত হয়। সেলুলয়েডের খেলনা ও চিরুণী, লোহার কড়ি, বরগা ও রেলিং, চীনে মাটির জিনিষ, ধাতুর বাসন ইত্যাদি বহু প্রকার জিনিষ এইরূপে প্রস্তুত হয়।

লুকান তাপ (Latent heat)—কোন কঠিন পদার্থ না গলা পর্য্যন্ত উহাকে যতই গরম কর না কেন, উহার গলিত অংশ ও কঠিন অংশের উষ্ণতা একই থাকে। ইহা খুব আশ্চর্য্য নয় কি?

পরীক্ষা—একটি কড়াইতে দুই সের মাখন রাখিয়া কড়াইটা জ্বলন্ত উনানে বসাইয়া দাও; একটি থার্ম্মোমিটার দিয়া মাখনের উষ্ণতা দেখ। উনানের উত্তাপ প্রায় ৪০০° ডিগ্রী হইলেও মাখন যতক্ষণ গলিবে ততক্ষণ উহার উষ্ণতা ৩৩° ডিগ্রীর বেশী হইবে

না। একটি বরফের চাপকেও গরম করিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা না গলে ততক্ষণ বরফ গলা জলের ও বরফের উষ্ণতা ০° ডিগ্রী থাকে।

এত যে তাপ দেওয়া হয় তাহা যায় কোথায়? কঠিন পদার্থকে গলাইয়া তরল করিবার জন্য পদার্থের অণুগুলির গতি বাড়াইতে ঐ তাপ খরচ হয়। এই তাপ থার্ম্মোমিটার দিয়া ধরা যায় না। সেইজন্য এই তাপকে **লুকান তাপ** বলে।

এক পোয়া জলকে ৮০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত গরম করিয়া ঐ জলে এক পোয়া বরফ দাও। বরফ গলিলে উভয় জলের উষ্ণতা ০° ডিগ্রী হইবে; কিন্তু এক পোয়া ৮০° ডিগ্রী গরম জলে এক পোয়া বরফের মত ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া দাও, ইহাদের উষ্ণতা হইবে ৪০° ডিগ্রী। প্রথমবারে মিশ্রিত জলের উষ্ণতা ০° ডিগ্রী হইল কেন, বল ত? এক পোয়া ৮০° ডিগ্রী জলে যে তাপ ছিল তাহা এক পোয়া বরফ গলাইতে খরচ হইয়াছে। বরফ গলাইতে এত তাপের দরকার হয়। গ্রীষ্মকালে শীতের দেশে বা উঁচু পাহাড়ের মাথায় বরফ গলিতে আরম্ভ করে। যদি অল্প তাপে বরফ গলিয়া যাইত তবে একদিনে এই বরফ গলা জলে দেশ ভাসিয়া যাইত।

সব কঠিন পদার্থই যে তাপে গলে তাহা নহে। কাপড়, বই প্রভৃতি তাপে গলে না, উহারা পুড়িয়া যায়।

জমাট বাঁধা—তাপ প্রয়োগে যেমন কঠিন জিনিষ তরল

হয়, তেমনি শীতল করিলে অধিকাংশ তরল জিনিষ জমিয়া কঠিন হয়। ইহাকে **জমাট বাঁধা** বলে।

শীতকালে ঘি, নারিকেল তেল জমিয়া এত শক্ত হয় যে, বোতল হইতে উহা ঢালা যায় না। সরিষার তেল, জল, স্পিরিট খুব ঠাণ্ডায় জমিয়া কঠিন হয়। এমন কি, বাতাসও অধিক ঠাণ্ডায় কঠিন হয়। কঠিন পদার্থ যে উষ্ণতায় গলিয়া যায় তরল পদার্থও সেই উষ্ণতায় জমাট বাঁধে। সুতরাং **হিমাঙ্ক ও গলনাঙ্ক একই উষ্ণতা**। খাঁটি মোম ৬৫° ডিগ্রীতে গলে ; গলা মোম জমাট বাঁধে ৬৫° ডিগ্রীতে।

গলিবার সময় পদার্থ যে তাপ চুরি করিয়া নিজের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দেয় তাহা সে হজম করিতে পারে না ; উহা জমাট বাঁধিবার সময় তাহার সমস্তটাই ফেরত দেয়। সেইজন্য জমাট বাঁধিবার সময় এই ফেরত দেওয়া তাপের জন্য পদার্থের উষ্ণতা একটু বাড়িয়া যায়। গলিত সীসা শীতল হইতে হইতে উষ্ণতা ৩২৮° ডিগ্রীতে নামিলে উহা জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করে ; কিন্তু খানিকটা জমাট বাঁধিলেই তাহার উষ্ণতা প্রায় ৩৩৮° ডিগ্রী হইয়া পড়ে।

সারাংশ—কঠিন হইতে তরল অবস্থাতে পরিবর্ত্তনকে গলন, তরল হইতে কঠিন অবস্থাতে পরিবর্ত্তনকে জমাট বাঁধা, তরল হইতে বাষ্পতে পরিবর্ত্তনকে বাষ্পীভবন এবং বাষ্প হইতে তরল অবস্থাতে পরিবর্ত্তনকে ঘনীভবন বলে। কঠিন পদার্থকে গলাইয়া তরল করিবার জন্য যে

তাপ দরকার হয় তাহাকে লুকান তাপ বলে। হিমাঙ্ক ও গলনাঙ্ক একই উষ্ণতা।

প্রশ্ন

১। জলের উদাহরণ দিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন কি করিয়া হয় বুঝাইয়া দাও।

২। কি করিয়া ভাঙ্গা সোনার গহনা জোড়া লাগাইবে? কঠিন পদার্থ যে তাপে গলিয়া যায় তাহার উদাহরণ দাও।

৩। কোন জিনিষ তাপে গলিতে আরম্ভ করিলে যতক্ষণ না সমস্তটা গলে ততক্ষণ তাহার উষ্ণতা বাড়ে না কেন?

পঞ্চম অধ্যায়

বাষ্পীভবন

তরল পদার্থের বাষ্প—আধ কড়াই জল জ্বলন্ত উনানে চাপাও। জল গরম হয়, জলের মধ্যে বুদ্বুদ্ উঠে। জল ফুটে। শেষকালে কড়াইতে জল থাকে না। এই জল যায় কোথায়? তাপে জল অদৃশ্য বাষ্প হইয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

সাধারণ উষ্ণতাতেও নদী, নালা, পুকুর, ভিজা মাটি হইতে জল অহঃরহ বাষ্পে পরিণত হইতেছে। ভিজা কাপড়ের জল ও শরীরের ঘাম ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হইয়া শুকাইয়া যায়।

একটি কেট্‌লিতে জল ফুটাও (২১ নং চিত্র)। কেট্‌লির

নলের ঠিক মুখে কোন বাষ্প দেখা যায় না, কারণ জলীয়বাষ্প অদৃশ্য। কিন্তু জলের একটু দূরে এই বাষ্প শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয় এবং ইহারা বাতাসে সাদা ধোঁয়ার মত ভাসিতে থাকে।

২১ নং চিত্র—বাষ্প

জলের মত অনেক তরল পদার্থ সাধারণ উষ্ণতায় বাষ্প হয়। হাতে একটু স্পিরিট বা পেট্রোল লইলে তাহা তৎক্ষণাৎ উবিয়া যায়। এইরূপে আতর, ক্লোরোফরম প্রভৃতির শিশি খুলিয়া রাখিলে উহাদের গন্ধে ঘর ভরিয়া যায়। কিন্তু ঘি, সরিষার তেল, নারিকেল তেল প্রভৃতি সাধারণ উষ্ণতায় বাষ্প হয় না। একটি ভাঁড়ে সরিষার তেল রাখিলে তাহা দশ বৎসরেও বাষ্প হইবে না।

কঠিন পদার্থের বাষ্প—কর্পূর, আইওডিন, ন্যাপ্‌থলিন প্রভৃতি অনেক কঠিন পদার্থ সাধারণ উষ্ণতায় তরল না হইয়া একেবারে বাষ্প হইয়া যায়।

বাষ্পীভবনের জন্য তাপের দরকার—বাষ্প হইবার সময় তরল পদার্থের তাপের দরকার হয়। এক কড়াই জল জ্বলন্ত উনানে চাপাইয়া দাও। জল ১০০° ডিগ্রীতে ফুটিতে

আরম্ভ করিবে। যতই কড়াইতে তাপ দাও না কেন, যতক্ষণ না সমস্ত জল বাষ্প হয় ততক্ষণ জলের উষ্ণতা ১০০° ডিগ্রী থাকে। এই তাপ যায় কোথায়? ইহা তরল পদার্থের অণুগুলির গতি বাড়াইয়া বাষ্পে পরিণত করিতে খরচ হইয়া যায়; ইহাকে বাষ্পের **লুকান তাপ** বলে। এই তাপের পরিমাণও কম নয়। এক সের জলকে এক ডিগ্রী হইতে ১০০° ডিগ্রীতে গরম করিতে যে তাপ দরকার হয়, ১০০° ডিগ্রীতে ফুটন্ত জলকে বাষ্পে পরিণত করিতে তার সাড়ে পাঁচ গুণ বেশী তাপের দরকার হয়।

অনেক তরল পদার্থ বাহির হইতে তাপ না দিলেও সকল সময়ই ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হয়। তখন তরল পদার্থ নিজ দেহ কিংবা তৎসংলগ্ন অন্য পদার্থ হইতে তাপ গ্রহণ করে। সেইজন্য ইহারা শীতল হইয়া যায়; যথা ঃ—

(১) পাখার বাতাস দিলে ঘাম দেহ হইতে তাপ চুরি করিয়া বাষ্পীভূত হয়; কাজেই আমরা শীতল বোধ করি।

(২) মাটির বা বালির কলসীর বা কুঁজার গায়ে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। উহাদের ভিতরের জল ছিদ্র দিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া বাহিরে আসে এবং বাষ্পীভূত হয়। মাটির কলসীর ভিতরের জল শীতল হয়। কিন্তু পিতলের কলসীর গায়ে ছিদ্র নাই। ইহাতে জল রাখিলে ঠাণ্ডা হয় না।

(৩) বেশী জ্বরের সময় মাথায় ও কপালে জলপটি

লাগাইয়া বাতাস দিলে জলের বাষ্পীভবনের সঙ্গে সঙ্গে মাথার উষ্ণতা কমে।

জলীয় বাষ্পের শক্তি—এক সের জলকে বাষ্পীভূত করিলে বাষ্পের ওজন একই থাকে কিন্তু আয়তন প্রায় পাঁচ শতের বেশী গুণ বাড়িয়া যায়। বাষ্পের এই প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা
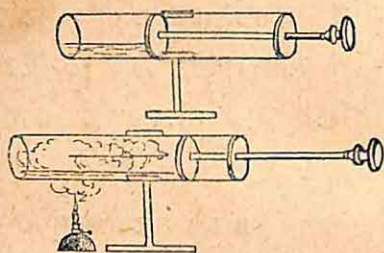
২২নং চিত্র—উপরের নলে জল আছে। নীচের নলে জলকে গরম করা হইতেছে। বাষ্পের জোরে দণ্ডটি ডান দিকে সরিয়া যাইতেছে।

এঞ্জিন ও কলকারখানা চলে। কেট্‌লিতে জল ফুটিবার সময় বাষ্পের জোরে ঢাক্‌নি কাঁপিতে থাকে। একটি দণ্ডযুক্ত নলের ভিতর জল ফুটাইলে জলের বাষ্প জোরে দণ্ডটি ঠেলিয়া দিবে।

বাষ্পীভবনের তারতম্যের কারণ—(১) একখানা ব্লটিং কাগজ যদি এক বালতি জলের মধ্যে ডুবাও, তবে উহা সব জল চুষিয়া লইতে পারে না। তোমার সামনে যদি দশ সের সন্দেশ রাখা যায় তুমি তাহা সব খাইতে পার না। তোমার খাইবার শক্তি তোমার ক্ষুধার উপর নির্ভর করে। সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট আয়তনের বায়ু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বাষ্প

ধারণ করিতে পারে। এইরূপ বায়ুকে **পূর্ণসিক্ত** (Saturated) বায়ু বলে।

পরীক্ষা—দুইটি বাটিতে সমান জল লও। একটি বাটি খোলা রাখ; অপরটিকে কাচপাত্র ঢাকা দাও। একদিন পরে দেখ ঢাকা বাটির জল অপেক্ষা খোলা বাটির জল অনেক কমিয়াছে। কেন? খোলা বাটির চারিদিকে বাতাস অনবরত চলাচল করাতে বাটির জল দ্রুত বাষ্পীভূত হইয়া যায়। কিছু বাতাস পূর্ণসিক্ত হইয়া চলিয়া যায়, আবার নূতন বাতাস আসে। কিন্তু ঢাকা বাটির জলের চারিদিকের বাতাস বদ্ধ। ইহাতে বাষ্পীভবন ধীরে ধীরে হয়।

(২) তাপ বাড়াইলে বায়ুর বাষ্প ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। সেইজন্য শীতল বাতাসের চেয়ে গরম বাতাসে বেশী বাষ্প থাকে।

গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা বেশী থাকে বলিয়া তাড়াতাড়ি ভিজা কাপড় শুকায়। আবার শীতকালে কম উষ্ণতার জন্য বাতাসে জলীয় বাষ্পও কম থাকে। সেইজন্য কাপড় শীঘ্র শুকায়। বর্ষাকালে গ্রীষ্মকালের মত তাপ থাকে না এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পও বেশী থাকে; সেইজন্য বর্ষাকালে কাপড় শীঘ্র শুকায় না।

(৩) বায়ুর গতি—জোরে বাতাস বহিলে ভিজা কাপড় শীঘ্র শুকায় কেন? কাপড়ের গায়ে বারবার নূতন বাতাস লাগে। কাপড় হইতে সেই বাতাস বাষ্প লইয়া দূরে চলিয়া

যায়। কাপড়ের নিকটের বাতাসে বেশী বাষ্প জমিতে পারে না।

(৪) **বায়ুর শুষ্কতা**—বায়ুতে যতটা জলীয় বাষ্প থাকিতে পারে তদপেক্ষা কম থাকিলে উহাকে শুষ্ক বায়ু বলে। বায়ু যত শুষ্ক হয় উহাতে বাষ্পীভবন তত বেশী হয়।

(৫) সাধারণ উষ্ণতায় তরল পদার্থের **কেবল উপরিভাগ হইতে বাষ্পীয় ভবন হয়**। সেইজন্য তরল পদার্থকে ছড়াইয়া রাখিলে উহার উপরিভাগের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, উহা শীঘ্র বাষ্পীভূত হয়। ভিজা কাপড় এক জায়গায় জড় করিয়া রাখিলে শীঘ্র শুকায় না। উহাকে মেলিয়া দিলে তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়।

সারাংশ—বাষ্পীভবনের জন্য যে তাপের দরকার তাহাকে **লুকান তাপ** বলে। বায়ু নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বাষ্প ধারণ করিতে পারে উষ্ণতা বাড়াইলে, বায়ুর গতি বাড়িলে বা বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকিলে বায়ুর বাষ্প ধারণ করিবার শক্তি বাড়িয়া যায়।

প্রশ্ন

১। বাষ্পীভবন কাহাকে বলে?

২। কেন হয় বল :—(ক) একটা থালায় জল রাখিলে ২।৩ দিনের মধ্যে থালার জল দেখা যায় না (খ) পাখার বাতাসে ঘর্ম্মাক্ত শরীরে ঠাণ্ডা লাগে কেন? (গ) বর্ষাকালে কাপড় শুকাইতে দেরী হয় কেন?

৩। পূর্ণসিক্ত বাতাস কাহাকে বলে? পূর্ণসিক্ত বাতাসকে ঠাণ্ডা করিলে বা গরম করিলে কি হয়?

৪। বাষ্পের লুকান তাপ কাহাকে বলে?

৫। কি কি কারণে কোন্ তরল পদার্থের বাষ্পীভবন বাড়ে বা কমে?

হাতের কাজ—পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর:—(১) জল ফুটাইলে উহা বাষ্পীভূত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প

একটি কাচের বা কাঁসার গ্লাসের ভিতর কিছু বরফ রাখ। কিছুক্ষণ পরে গ্লাসের বাহিরের গায়ে ঘামের মত ফোঁটা ফোঁটা জল দেখিতে পাইবে। গ্লাসের বাহিরে জল কোথা হইতে আসিল? গ্লাসের ভিতরের জল কখনও বাহিরে আসিতে পারে না। কাজেই গ্লাসের চারিদিকে বাতাস হইতে জলকণা আসিয়াছে। বাতাসে অদৃশ্য অবস্থায় জলীয় বাষ্প মিশিয়াছিল। গ্লাসের ঠাণ্ডা গায়ে লাগিয়া গ্লাসের চারিপাশের বাতাস ঠাণ্ডা হয়; সেইজন্য ইহার বাষ্প ধারণ করিবার শক্তিও কমিয়া যায়। কাজেই

২৩নং চিত্র—গ্লাসের বাহিরের গায়ে বাষ্প জমিয়া জল বিন্দু হইয়াছে।

অতিরিক্ত বাষ্প ঠাণ্ডায় জমিয়া জল-কণা হয় এবং তাহাই গ্লাসের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা লাগিয়া থাকে।

সূর্য্যতাপে সাগর, নদ-নদী প্রভৃতি জলাশয় হইতে জল সর্ব্বদা বাষ্পীভূত হইয়া বাতাসে মিশিতেছে। নানা কারণে বাতাসের উষ্ণতা কখনও বাড়ে, কখনও কমে। **বাতাসে জলীয় বাষ্পই শীতল হইয়া শিশির, কুয়াসা মেঘ ও বৃষ্টিতে পরিণত হয়।**

শিশির—শরৎকালের ভোরবেলায় গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায়, পাথরের উপর শিশির-বিন্দু সোনালী রৌদ্রে মুক্তার মত ঝক্‌ঝক করে। এই শিশির কোথা হইতে আসে? সূর্য্যাস্তের পর সকল পদার্থ তাপ ছাড়িয়া দিয়া শীতল হয়। শীতল পদার্থের সংস্পর্শে পদার্থের নিকটবর্ত্তী বাতাসও শীতল হয়। ইহাতে বাতাসের বাষ্প ধারণ করিবার শক্তি কমিয়া যায় এবং উদ্বৃত্ত বাষ্প জলকণার আকারে পদার্থের গায়ে জমে।

ঘাস, লতাপাতা, পাথর শীঘ্র শীঘ্র তাপ ছাড়িয়া দেয়। ঘাস, লতাপাতা হইতে জলও বেশী বাষ্পীভূত হয়। এই সকল জিনিষের গায়ে শিশির বেশী হয়।

শিশির বৃষ্টির ন্যায় আকাশ হইতে পড়ে না। শরৎকালে রাত্রিতে একখানি থালা বাহিরে রাখিয়া দিলে দেখিতে পাইবে, থালার নীচের দিকেও শিশির জমিয়াছে।

রাত্রিতে আকাশে মেঘ থাকিলে বা জোরে বাতাস বহিলে ভোরের সময় শিশির দেখা যায় না। কারণ মেঘের জন্য তাপ

বিকীর্ণ হইতে পারে না এবং বাতাস বহিলে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমিয়া যায়।

কুয়াসা—শীতকালে প্রাতে চারিদিক ঘন কুয়াসায় ঢাকিয়া যায়। নিকটের জিনিষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না এবং ঘরের বাহির হইলে জামা কাপড় জলে ভিজিয়া যায়।

জলাশয়ের ধারেই এই কুয়াসা বেশী হয় কেন? রাত্রে সব জিনিষই তাপ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু জলের চেয়ে স্থলভাগ বেশী তাপ ছাড়ে। জল ও তাহার উপরের বাষ্পপূর্ণ বাতাস বেশী গরম থাকে। এই বাতাস যখন স্থলের উপরকার শীতল বাতাসের সঙ্গে মিশে, তখন তাহার তাপ কমিয়া যায়; উহা আর পূর্ব্বের মত জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে না। উদ্বৃত বাষ্প বাতাসের ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া অতি ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয় এবং বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। বড় বড় সহরে বা কল-কারখানার জায়গায় কুয়াসা বেশী হয়। কারণ সেখানকার বাতাসে অনেক ধূলিকণা থাকে। সূর্য উঠিলে বায়ু গরম হয়, সঙ্গে সঙ্গে কুয়াসাও বাষ্প হইয়া মিলাইয়া যায়।

মাটির ঠিক উপরকার বাতাস যখন আকাশেয় উচু জায়গার বাতাস হইতে বেশী ঠাণ্ডা হয়, তখনও কুয়াসা হয়! কারণ নীচের বাতাস গরম হইলে উহা হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। তখন নীচে কুয়াসা হয় না।

মেঘ—উঁচু আকাশে যখন জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় তখন আমরা তাহাকে **মেঘ** বলি।

অনন্ত আকাশে নানা বর্ণের মেঘের খেলা দেখিতে কেমন সুন্দর লাগে! কখনও মেঘগুলি এক জায়গায় স্থির হইয়া আছে, কখনও ধীরভাবে চলিতেছে, কখনও বাতাসের সঙ্গে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। কখনও নীল আকাশে দুই এক খণ্ড সাদা মেঘ দেখা যায়, কখনও সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢাকিয়া যায়। এত উচ্চে মেঘগুলি কেমন করিয়া হয় জান?

ভারী জিনিষের মধ্যে হাল্‌কা জিনিষ থাকিলে উহা উপরে উঠে। শোলা জলে ডুবাইয়া দিলে উহা উপরে উঠিয়া ভাসে! সূর্য্যতাপে সমুদ্র ও নদনদী হইতে জল অনবরত বাষ্প হইয়া বাতাসের সহিত মিশিতেছে।

বায়ু অপেক্ষা জলীয় বাষ্প হালকা। বায়ুতে যতই জলীয় বাষ্প জমে, ততই উহা হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিতে থাকে। মাটি হইতে দূরবর্ত্তী উপরের বাতাস ঠাণ্ডা ও ভারী, মাটির নিকটবর্ত্তী বাতাস অপেক্ষাকৃত গরম ও হাল্‌কা। এই কারণেও বাতাস উপরে উঠিতে থাকে। গ্যাসের বিষয় মনে রাখিবে যে, গ্যাস প্রসারিত হইলে শীতল হয় এবং সঙ্কুচিত হইলে গরম হয়। কেন হয় পরে জানিবে।

বাষ্পপূর্ণ গরম বাতাস যতই উপরে উঠিতে থাকে উহার উপর ঊর্দ্ধতন বায়ুর চাপ ততই কমিতে থাকে। এই ঊর্দ্ধগামী বাতাস আয়তনে প্রসারিত হয়, সেইজন্য উহার তাপ কমিয়া যায়। আবার উপরের বায়ু স্বভাবতঃ শীতল থাকে। উপরের শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া এই ঊর্দ্ধগামী বাতাসের তাপ

আরও কমে। অতএব উর্দ্ধগামী বাতাস সমস্ত বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না। অতিরিক্ত বাষ্প উর্দ্ধে ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয় এবং আকাশে ভাসিতে থাকে। উর্দ্ধস্তরের এই ভাসমান ও দৃশ্যমান জলকণাকে **মেঘ** বলা হয়।

২৪নং চিত্র—নানারকমের মেঘ।

আকাশে নানা রকমের মেঘ দেখা যায়। এক প্রকার মেঘ খুব উঁচুতে জমা হয়। ইহা কুণ্ডলীর আকারে থাকে, এই জাতীয় মেঘকে **কুণ্ডলী মেঘ** (ক) বলে। গ্রীষ্মকালে ধোনা তুলার স্তূপের মত আর এক প্রকার মেঘ দেখা যায়। ইহাকে

স্তূপ মেঘ (খ) বলে। বর্ষাকালে আকাশে নীচের দিকে যে কাল রঙের মেঘ দেখা যায়, তাহাকে **বাদল** (ঘ) বলে। ইহাতে বৃষ্টি হয়। পরিষ্কার দিনে আকাশের গায়ে স্তরে স্তরে ধূসর বর্ণের মেঘ দেখা যায়; ইহাকে **স্তর** (গ) মেঘ বলে।

বৃষ্টি—আকাশে বায়ুভরে খণ্ড খণ্ড মেঘ ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায় এবং অনেকগুলি ছোট ছোট মেঘে বড় বড় মেঘ হয়। এই সকল মেঘ মাঝে মাঝে পর্ব্বতগাত্রে আট্‌কাইয়া যায় এবং পর্ব্বতগাত্র বহিয়া আরও উপরে উঠিতে থাকে। উচ্চ পর্ব্বতগাত্র শীতল থাকে। আরও উপরে উঠিয়া মেঘ শীতল পর্ব্বতগাত্রের সংস্পর্শে আসে। ইহাতে মেঘের ছোট ছোট জলকণাসমূহ আরও জমিয়া ও একত্রে মিলিত হইয়া বড় ও ভারী হইয়া পড়ে। অধিক ভারের জন্য উহারা তখন আর বাতাসে ভাসিতে পারে না; পৃথিবীর আকর্ষণে **বৃষ্টিরূপে** মাটিতে পড়ে। বৃষ্টির ফোঁটা অনেক সময় মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই খুব ঠাণ্ডা বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে জমিয়া কঠিন বরফ হইয়া যায়। ইহাকে চল্‌তি কথায় **শিলাবৃষ্টি** বলে।

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে কিংবা পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানে সাধারণতঃ বৃষ্টি হয়।

বৃষ্টিমাপক যন্ত্র—কোন্‌খানে **কতটা বৃষ্টি** হয় তাহা নানা কারণে জানা দরকার। উঠানে ফাঁকা জায়গায় একটি বড় বোতলের মুখে একটি চুঙ্গী রাখ। চুঙ্গীর লম্বা নলটি যেন বোতলের তলা পর্য্যন্ত পৌঁছে। চুঙ্গীর মুখে যে বৃষ্টি পড়িবে

তাহা বোতলে জমিবে। সমস্ত দিনের জল একটি দাগ-কাটা গ্লাসে মাপিয়া দেখিবে কত ইঞ্চি বৃষ্টি পড়িয়াছে।

সারাংশ—বাতাসের জলীয় বাষ্প শীতল হইয়া মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াসা শিশির হয়। শরৎকালে রাত্রে পদার্থ সকল তাপ ছাড়িয়া দিলে নিকটস্থ জলীয় বাষ্প শীতল হইলে শিশির উৎপন্ন হয়। শীতকালে নীচের বাতাসের জলীয় বাষ্প জমিলে কুয়াসা হয়। উঁচু আকাশের জলীয় বাষ্প জমিলে মেঘ হয়। মেঘের জলকণা একত্রে মিশিয়া বৃষ্টির সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন

১। বায়ুর যে জলীয় বাষ্প আছে তাহা কি করিয়া দেখাইবে?

২। শিশির কিরূপে হয়? রাত্রিতে মেঘ থাকিলে বা বাতাস বহিলে শিশির হয় না কেন? শীতকালে শিশির কম হয় কেন?

৩। মেঘ ও বৃষ্টি কিরূপে উৎপন্ন হয়? মেঘ কয় প্রকারের? কোন্ স্থানে কতটা বৃষ্টি পড়িয়াছে কি করিয়া মাপিবে? (M. E. 1940)

৪। কুয়াসার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা কর। (M. E.

৫। মেঘের উৎপত্তির বিষয় যাহা জান বল।

রসায়ন-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

মিশ্রণ (Mixture) ও দ্রবণ (Solution)

মিশ্রন—মুড়ি ও মুড়কি, চাল ও কাঁকর, পৃথক ভাবে দুই দুইটি জিনিষ একত্রে মিশাও। বর্ণ ও আকার দেখিয়া তোমরা মুড়ি হইতে মুড়কি, চাল হইতে কাঁকর পৃথক্ করিতে পার। মুড়ি ও মুড়কি, চাল ও কাঁকর পাশাপাশি দেখিতে পাইবে।

পরীক্ষা—লোহার গুড়া ও গন্ধকের গুড়া একত্রে ভাল করিয়া মিশাও। লোহার বর্ণ কাল, গন্ধকের বর্ণ হল্‌দে। কিন্তু মিশ্রিত পদার্থের ও গন্ধকের বর্ণ হয় দুইয়ের মাঝামাঝি। লোহা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং গন্ধক Carbon Disulphide নামক পদার্থে গলিয়া যায়। লোহা ও গন্ধকের ইহাকে চর কাছে চুম্বক লইয়া যাও। লোহার গুড়া চুম্বকে সমুদ্রে ৬নং চিত্র) হয়; গন্ধক পড়িয়া থাকে। মিশ্রণকে সাধারণতঃ Disulphideএর মধ্যে ফেলিয়া দাও। গন্ধক বৃষ্টিমাগ্ন, লোহা পড়িয়া থাকে।

কারণে জানা দুই বা ততোধিক পদার্থ একত্রে মিশাইলে যদি বোতলের পদার্থের বর্ণ, আকার, স্বাদ প্রভৃতি ধর্ম্ম বজায় থাকে বোতলের র্ত্তর এইরূপ সমবায়কে **মিশ্রণ** বলে।

পরীক্ষা—একটি গ্লাসে জল লইয়া তাহাতে অল্প চিনি ফেলিয়া দাও। জল একটি কাঠি দিয়া নাড়িয়া দাও। জলের মধ্যে চিনি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জল মুখে দিলে মিষ্ট লাগে। অপর এক গ্লাসে জল লইয়া জলে লবণ ফেলিয়া দাও—লবণের দানাও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐ জল মুখে দিলে নোনতা লাগে। জলে তুঁতে দিলে সমস্ত জল নীলবর্ণ হয়, তুঁতে দেখা যায় না।

২৫নং চিত্র—ডানদিকের গ্লাসে চিনি জলে গলিয়া গিয়াছে, বামদিকের গ্লাসের তলায় বালি পড়িয়া আছে।

চিনি, লবণ বা তুঁতে জলের মধ্যে সর্ব্বত্র অদৃশ্য অবস্থায় সমান ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। উহারা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। একটি পাত্রে ঐ চিনি, লবণ বা তুঁতের জলকে গরম কর; দেখিবে জল উবিয়া গিয়াছে এবং চিনি, লবণ বা তুঁতে পাত্রে পড়িয়া আছে।

পরীক্ষা—জলের মধ্যে বালি ফেলিয়া দাও। কাঠি দিয়া নাড়িলেও উহা খানিক পরে পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকে।

এইরূপে ময়দা, লোহা, গন্ধক প্রভৃতির চূর্ণ জলে মিশাইলে পরীক্ষা করিলেও দেখিতে পাইবে যে, জল স্থিরভাবে রাখিলে ময়দা, লৌহ, গন্ধক প্রভৃতির চূর্ণ পাত্রের তলদেশে জমা হইয়া থাকে। অতএব দেখ যে, চিনি, লবণ, তুঁতে প্রভৃতি পদার্থ জলে দ্রবণীয় কিন্তু গন্ধক, লৌহ প্রভৃতি পদার্থ জলে দ্রবণীয় নহে।

কর্পূর বা গালা জলে ফেলিয়া দিলে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু স্পিরিটে গালা ও কর্পূর দ্রবীভূত হয়।

স্পিরিট, দুধ প্রভৃতি তরল পদার্থও জলে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু তেল জলে দ্রবীভূত হয় না। জলের ভিতর বাতাসও দ্রবীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়। একটি পাত্রে জলকে গরম করিলে বাতাস বুদ্‌বুদের আকারে বাহিরে আসে। সোডা-ওয়াটারের বোতলের মুখ খুলিলে এক প্রকার গ্যাস জোরে বাহির হয়; সেইজন্য উহা চারিদিকে ছিটাইয়া যায়। উহা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

জলের মধ্যে চিনি বা লবণ বা এইরূপ কোন দ্রবীভূত পদার্থের মিশ্রণকে **দ্রবণ** (Solution) বলে, জলকে **দ্রাবক** (Solvent) এবং চিনি ও লবণকে **দ্রাব্য** (Solute) পদার্থ বলে। লৌহ, ময়দা, গন্ধক, গালা, কর্পূর বা বালি যাহা জলে দ্রবীভূত হয় না, তাহাদিগকে জলে **অদ্রব্য** (Insoluble) পদার্থ বলে।

পরিপূর্ণ দ্রবণ (Saturated Solution)—**পরীক্ষা**—একটি গ্লাসে অনেকখানি জল লইয়া তাহাতে অল্প অল্প করিয়া

চিনি দাও এবং একটি কাঠি দিয়া নাড়িতে থাক। ক্রমশঃ চিনির মাত্রা বাড়াইয়া দাও। এইরূপ করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে, চিনি আর দ্রবীভূত হইতেছে না; গ্লাসকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখিলেই অতিরিক্ত চিনি গ্লাসের তলায় পড়িয়া থাকিবে।

আমাদের খাওয়ার একটি সীমা আছে। আমাদের সম্মুখে যতই খাবার থাকুক না, আমরা সব খাইতে পারি না। সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলও যত খুসী চিনি দ্রবীভূত করিতে পারে না; ইহারও একটি সীমা আছে। এই সীমা পর্য্যন্ত পৌছিলে চিনির দ্রবণকে **পরিপূর্ণ দ্রবণ** বলে।

গ্লাসের চিনি-মিশ্রিত জলকে গরম করিলে উহার তলাকার অতিরিক্ত চিনি ক্রমশঃ দ্রবীভূত হইয়া যাইবে; উষ্ণতা কমাইলে দ্রবীভূত চিনি দানা বাঁধিয়া গ্লাসের ভিতর জমিবে। আবার জলের পরিমাণ বাড়াইয়া দাও; বেশী চিনি দ্রবীভূত হইবে।

অতএব দেখা যায়, সাধারণতঃ **দ্রাবকের পরিমাণ বাড়াইলে বা উষ্ণতা বাড়াইলে দ্রাবক অধিক দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত করিতে পারে।**

অধিকাংশ কঠিন পদার্থ গরম জলে বেশী দ্রবীভূত হয়; অধিকাংশ গ্যাসীয় পদার্থ ঠাণ্ডা জলে বেশী দ্রবীভূত হয়। অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে।

সারাংশ :—মিশ্রণ ও দ্রবণের তুলনা

বালি ও জলের মিশ্রণ	চিনি ও জলের দ্রবণ
১। যে কোন পরিমাণ বালি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলে মিশান যায়।	১। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চিনি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলে দ্রব করা যায়।
২। বালি ও জল পাশাপাশি থাকে। বালি দেখা যায়।	২। চিনি দেখা যায় না।
৩। বালিকে ছাঁকিলেই পৃথক্ করা যায়।	৩। দ্রবণ ছাঁকিলে চিনি পাওয়া যায় না। দ্রবকে পরিস্রুত করিলে চিনি পাওয়া যায়।
৪। মিশ্রণে সর্ব্বত্র সমান অংশ বালি ও জল থাকে না।	৪। দ্রবণের সর্ব্বত্র সমান অংশ চিনি থাকে।

প্রশ্ন

১। জলের মধ্যে চিনি বা লবণ ফেলিয়া দিলে তাহা কোথায় থাকে? পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। দ্রবণ, দ্রাবক ও পরিপূর্ণ দ্রবক কাহাকে বলে?

৩। কি হয় বল :—

জলের মধ্যে অল্প চিনি দাও; বেশী চিনি দাও; জলকে গরম কর, জলকে ঠাণ্ডা কর। জলের মধ্যে গালা, বালি, লোহা দাও। স্পিরিটে গালা দাও।

হাতের কাজ—নিজ হাতে পরীক্ষা কর—(১) চিনি জলে দ্রবীভূত হয়। (২) বালি জলে দ্রবীভূত হয় না। (৩) স্পিরিটে গালা দ্রবীভূত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃথকী-করণ প্রণালী

(Methods of Separation)

দুইটি পদার্থ মিশ্রিত হইলে তাহাদিগকে নানা উপায়ে পৃথক্ করা যায়। যথা :—

(১) **সাধারণ প্রণালী**—চাল কিম্বা ডালের সহিত কাঁকর মিশান থাকিলে তাহা আমরা হাত দিয়া বাছিয়া লই, অথবা কুলা দিয়া ঝাড়িয়া লই। সুজি প্রভৃতি দ্রব্যের ছোট দানার সহিত অন্য দ্রব্যের মোটা দানা মিশান থাকিলে আমরা চালুনি দিয়া চালিয়া লই। খই যখন চালুনি দিয়া চালা হয়, তখন খইএর ধানের খোসা চালুনির ছিদ্র দিয়া চলিয়া যায় খই চালুনিতে আট্‌কাইয়া থাকে।

(২) **আস্রাবন—(Decantation)**—ঘোলা জল একটি গ্লাসে স্থিরভাবে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে পাত্রের তলায় কাদা জমে এবং উপরকার জল অনেকটা পরিষ্কার থাকে। আস্তে আস্তে পাত্রটি কাত্ করিয়া উপরকার পরিষ্কার জল অন্য পাত্রে ঢালিয়া কাদা হইতে জল পৃথক্ করা যায়। **ভারী ও জলে অদ্রাব্য পদার্থ এইরূপ জল দ্বারা পৃথক করা যায়।** ধনে ও লঙ্কার সহিত ধূলা-বালি আংশিক মিশান থাকিলে জলের মধ্যে তাহা ফেলিয়া দিতে

২৬নং চিত্র—
আস্রাবন।

হয়। হাল্‌কা ধনে ও লঙ্কা জলে ভাসিয়া উঠে এবং ধূলা-বালি প্রভৃতি ভারী বলিয়া পাত্রের তলায় জমে।

চিনির সহিত বালি মিশান থাকিলেও উহাদের জলে ফেলিয়া থিতাইয়া পৃথক করা যায়।

(৩) ছাঁকন (Filtration)—চিনি ও বালি একত্র মিশান আছে; কি করিয়া পৃথক করিবে? চিনি ও বালি বাছিয়া বা চালুনি দিয়া চালিয়া পৃথক্ করা যায় না। জলের মধ্যে এই মিশ্র পদার্থ ফেলিয়া দাও। চিনি জলে দ্রবীভূত হইবে বালি অদ্রাব্য থাকিবে। ন্যাকড়ায় ছাঁকিলে চিনির সরবৎ ন্যাকড়ার ছিদ্রের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবে কিন্তু বালি ন্যাকড়ায় আটকাইয়া থাকিবে। এইরূপে ইহাদিগকে ভালভাবে পৃথক করা যায় না; কারণ ন্যাকড়ার ছিদ্রগুলি একটু বড়। ব্লটিং কাগজ বা ফিলটার কাগজের ছিদ্রগুলি অতি সূক্ষ্ম। ইহার মধ্য দিয়া ভাল ভাবে ছাঁকা যায়।

পরীক্ষা—একখানি ব্লটিং কাগজকে গোল করিয়া কাট।
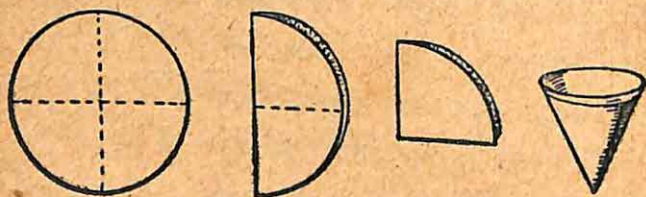
২৭নং চিত্র—ফিল্‌টার কাগজ ভাঁজ করার প্রণালী

ইহাকে প্রথমে অর্দ্ধেক ভাঁজ কর। তারপর এই অর্দ্ধেককেও

অর্দ্ধেক ভাঁজ কর। এখন ইহার তিন ভাঁজ একদিকে রাখিয়া একটি চুঙ্গীর মত কর। ইহাকে একটু জলে ভিজাইয়া একটি ফানেলের (Funnel) গায়ে ভালরূপে বসাইয়া দাও ফানেলকে একটি ফ্লাস্কের মুখে রাখ। একটি কাচদণ্ডের সাহায্যে পাত্র হইতে বালি মিশ্রিত চিনির সরবৎ ফানেলের মধ্যে ঢালিয়া দাও। দেখ, চিনির জল আস্তে আস্তে ব্লটিং কাগজের ছিদ্র দিয়া নীচের ফ্লাস্কে চলিয়া যায়। বালি ব্লটিং কাগজে আট্‌কাইয়া থাকে। নীচের পাত্রের চিনির জলকে ফুটাইলে জল বাষ্পীভূত হইয়া যায়, চিনি পাত্রে পড়িয়া থাকে। ফানেলের উপর এক গ্লাস ঘোলা জল ঢালিয়া দাও; দেখ কাদা ব্লটিং কাগজে আট্‌কাইয়া যায়। পরিষ্কার জল নীচের পাত্রে চলিয়া যায়।

২৮নং চিত্র—ছাঁকন ক্রিয়া।

দুইটি দ্রবীভুত পদার্থকে ছাঁকিয়া পৃথক্ করা যায় না। উহারা তরল পদার্থের সঙ্গে ছিদ্রের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, যথা—চিনি ও লবণ।

ফিলটার—তোমরা ফিলটারে জল পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছ? ইহাতে চারিটি কলসী একটি কাঠের ফ্রেমে বসান থাকে; উপরের তিনটি কলসীর তলায় ছিদ্র থাকে। প্রথম কলসীতে অপরিষ্কার জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, দ্বিতীয় কলসীতে

পরিস্কার কাঠ-কয়লা ও তৃতীয় কলসীতে বালি থাকে। ঘোলা জল কয়লা ও বালির স্তরের মধ্য দিয়া চুয়াইয়া যায়। ইহাতে উহার ভাসমান ময়লা আট্‌কাইয়া যায়। সর্ব্বনিম্ন কলসীতে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। (২৯নং চিত্র)

২৯নং চিত্র—ফিল্‌টার

(৪) **পাতন বা চূয়ান** (Distillation)—তরল পদার্থের সহিত অন্য কঠিন পদার্থ মিশান থাকিলে তরল পদার্থকে তাপে বাষ্পীভূত করিয়া বাষ্পকে পুনরায় শীতল করিলে বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তরল অবস্থায় আসে। এই প্রক্রিয়াকে **পাতন** বা **চুয়ান** বলে। ইহাতে প্রথমে তরল পদার্থের **বাষ্পীভবন** পরে বাষ্পের **ঘনীভবন** হয়। অনেক ক্ষেত্রে দুইটি তরল পদার্থকেও এইরূপে পৃথক করা যায়।

পরীক্ষা—একটি ফ্লাস্কে কিছু লবণ মিশ্রিত জল লও। উহাতে অল্প একটু তুঁতে দাও। জল নীলবর্ণ হইবে। ফ্লাস্কের মুখে কর্কের মধ্য দিয়া একটি বাঁকা ছোট নল লাগাও। এই ছোট বাঁকা নলকে অপর একটি লম্বা সরু নলের মুখে কর্ক দিয়া লাগাইয়া দাও। এই লম্বা নলকে চারিদিকে ঘিরিয়া একটি মোটা নল আছে। মোটা নলের গায়ে দুইটি ছিদ্র আছে। ইহাদের একটি দিয়া ঠাণ্ডা জল মোটা নলে ঢুকে এবং অপরটি

দিয়া এই জল বাহির হইয়া যায়। সরু নলের শেষভাগ একটি পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। এই সরু ও মোটা নলকে একত্রে **ঘনীকরণ-যন্ত্র** (Condenser) বলে। একটি তেপায়ার
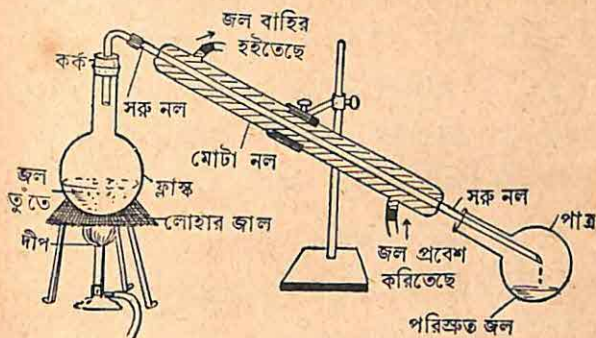
৩০নং চিত্র—পাতন-ক্রিয়া।

(Tripod Stand) উপর একটি লোহার তারের জাল রাখ। জলশুদ্ধ ফ্লাস্ককে ঐ জালের উপর রাখিয়া গরম কর। জালের উপর রাখিয়া কোন পাত্র গরম করিলে উহার সকল অংশ সমানভাবে উত্তপ্ত হয়। ইহাতে পাত্র ফাটিয়া যায় না। মোটা নলের ভিতর ঠাণ্ডা জল প্রবেশ করাও। তাপে জল বাষ্প হয় কিন্তু তুঁতে বা লবণ বাষ্প হয় না। জলের বাষ্প সরু নলের মধ্য দিয়া যাইবার সময় চারিদিকের শীতল জলস্রোতের জন্য পুনরায় ঘনীভূত হইয়া বিশুদ্ধ জলে পরিণত হয়। নলটি কাত্ অবস্থায় থাকার জন্য ঐ জল শেষের পাত্রে গিয়া জমে। কিন্তু লবণ ও তুঁতে ফ্লাস্কে পড়িয়া থাকে।

শেষের পাত্রের জল বর্ণহীন ও স্বাদহীন হয়। এই জলকে **পাতিত** বা **পরিস্রুত** জল (Distilled water) বলে।

পরীক্ষা—একটি ফ্লাস্কে স্পিরিট ও জল লও। ফ্লাস্কের কর্কে দুইটি ছিদ্র কর। একটি ছিদ্র দিয়া একটি থার্মোমিটার লাগাও। অপর ছিদ্র দিয়া একটি বাঁকা নলের সঙ্গে ঘনীকরণ-যন্ত্রের যোগ কর। ফ্লাস্ককে গরম কর।

স্পিরিট ৭০ ডিগ্রীতে ফুটে, জল ১০০ ডিগ্রীতে ফুটে, কাজেই প্রায় ৭৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত স্পিরিট বেশী বাষ্পীভূত হয়। জল কম বাষ্পীভূত হয়। শেষের পাত্রে স্পিরিট বেশী জমে। এইরূপে **স্পিরিট ও জল মোটামুটি পৃথক করা যায়।**

সাগর, নদী, কূপ, পুকুরের জল পাতন-ক্রিয়া দ্বারা বিশুদ্ধ করা হয়। পাতিত জল অনেক কাজে প্রয়োজন হয়।

৩১নং চিত্র-উর্দ্ধপাতন

(৫) **উর্দ্ধপাতন** (Sublimation)—**পরীক্ষা**—একটি পাত্রে খানিকটা কর্পূর ও লবণ মিশ্রিত করিয়া একটি ফানেল চাপা দাও। পাত্রে তাপ প্রয়োগ কর। দেখিবে, কর্পূর উবিয়া গিয়া ফানেলের ঠাণ্ডা গায়ে (ক) লাগে এবং জমিয়া কঠিন হয়। লবণ পাত্রে পড়িয়া থাকে।

এখানে কর্পূর তাপে তরল না হইয়া একেবারে বাষ্প হইল

এবং বাষ্প ঠাণ্ডায় জমিয়া পুনরায় ঘন হইল। এই প্রক্রিয়াকে **উর্দ্ধপাতন** বলে। কবিরাজগণ এই উপায়ে ধূলা-বালি হইতে কর্পূর পরিষ্কার করিয়া লন।

(৬) দানাবাঁধা (Crystallisation)ঃ—**পরীক্ষা**—একটি
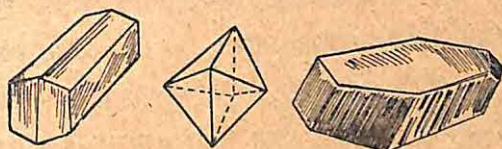
৩২নং চিত্র বিভিন্ন দ্রব্যের দানা।

পাত্রে যতটা সম্ভব লবণ দ্রবীভূত কর। উহাকে ছাঁকিয়া লইয়া একটি পাত্রে গরম কর। জল অনেকটা বাষ্পীভূত হইয়া যাইলে পাত্রটিকে স্থিরভাবে ঠাণ্ডা হইতে দাও। পরে দেখ, লবণ দানার আকারে জল হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। একটি চিনির ছোট দানাকে সূতা দিয়া বাঁধিয়া চিনির সরবতের মধ্যে রাখিলে চিনির বড় দানা গঠন করা যায়।

লোহাচুর ও গন্ধকের পৃথকী-করণ—(১) চুম্বকের ধর্ম্ম লোহাকে আকর্ষণ করা। লোহাচুর ও গন্ধকের মিশ্রণের মধ্যে চুম্বক ঢুকাইলে চুম্বক দ্বারা মাত্র লোহাচুর আকৃষ্ট হয় এবং গন্ধক পড়িয়া থাকে। (২) মিশ্রণকে Carbon Disulphideএর মধ্যে ফেলিয়া দিলে গন্ধক দ্রবীভূত হয়; লোহাচুর হয় না। উহাদিগকে ফিল্‌টার করিলে লোহাচুর ফিল্‌টার কাগজে আট্‌কাইয়া যায় এবং Carbon Disulphide ও

গন্ধকের দ্রবণ নীচের পাত্রে জমে। তারপর পাতন-ক্রিয়া দ্বারা গন্ধক ও Carbon Disulphide পৃথক্ করা যায়।

সারাংশ—ভারী ও জলে অদ্রাব্য পদার্থ জলে মিশ্রিত করিয়া পৃথক্ করাকে **আস্রাবন** বলে। একটি দ্রাব্য ও অদ্রাব্য পদার্থ একত্রে মিশাইয়া ফিলটার কাগজের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া ফেলিয়া পৃথক্ করা যায়। ইহাকে **ছাঁকন-ক্রিয়া** বলে। লবণ ও কর্পূর গরম করিলে কর্পূর উবিয়া যাইবে, লবণ পড়িয়া থাকিবে। ইহাকে **উর্দ্ধপাতন** বলে। দ্রাবক হইতে দ্রাব্যকে পৃথক করাকে **দানাবাঁধা** বলে।

প্রশ্ন

১। দ্রবণ ও মিশ্রণ কাহাকে বলে? ইহাদের পার্থক্য কি?

২। কি করিয়া পৃথক করিবে?—চিনি ও বালি; জল ও চিনি; বালি ও জল; কাঁকর ও বালি; লঙ্কা ও ধূলা; কাঁকর ও চাল।

৩। ঘনীকরণ-যন্ত্র কাহাকে বলে? পাতন-ক্রিয়া ও ছাঁকন-ক্রিয়া বর্ণনা কর।

৪। কি হয় বল:—একটি পাত্রে অনেক চিনি দ্রবীভূত করিয়া যদি ছাঁকিয়া রাখা হয়? একটি গ্লাসে যদি ঘোলা জল রাখা হয়।

৫। লোহাচুর ও গন্ধকের মিশ্রণ হইতে লোহাচুর পৃথক্ করিতে চুম্বকের দরকার কেন?

(M. E. 1934)

তৃতীয় অধ্যায়

রাসায়নিক সংযোগ

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ—তিন ভাগ লোহাচুর ও দুই ভাগ গন্ধক একত্রে একটি পাত্রে খুব গরম করিলে এমন একটা নূতন পদার্থ পাইবে যাহার কোন অংশই চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হইবে না বা Carbon Disulphideএ দ্রবীভূত হইবে না। লোহার বা গন্ধকের সমস্ত গুণ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। নূতন পদার্থকে **যৌগিক পদার্থ** (Compound) বলে। লোহা ও গন্ধককে **মৌলিক পদার্থ** (Element) বলে। মৌলিক পদার্থ হইতে বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট অন্য পদার্থ পাওয়া যায় না। লোহা ও গন্ধকের এইরূপ মিলনকে **রাসায়নিক সংযোগ** বলে। পৃথিবীতে ৯২টি মৌলিক পদার্থ আছে। জল, মাটি, পশুপক্ষী, ও জীবজন্তুর দেহ প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ এই কয়টি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে বা রাসায়নিক সংযোগে গঠিত।

দহন—ম্যাগ্‌নেসিয়ামের তার (বাজারের 'Electric' তার) কাগজ, দেয়াশেলাই, বাতি জ্বালিলে আমরা আলো ও তাপ পাই।

এইরূপ জ্বলন্ত পদার্থকে চাপা দিলে অর্থাৎ বায়ুর সংস্পর্শ বন্ধ করিলে উহারা তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যায়। সুতরাং বায়ুতে

এমন পদার্থ আছে যাহা কোন পদার্থকে জ্বলিতে সাহায্য করে। বায়ুর যে পদার্থের জন্য আমরা আলো ও তাপ পাই তাহাকে **অক্সিজেন**—(Oxygen) বলে। জ্বলিবার সময় অক্সিজেনের সঙ্গে জ্বলন্ত পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হয়। কোন পদার্থের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগের সময় যদি আলো ও তাপ উদ্ভব হয় তবে এই প্রতিক্রিয়াকে **দহন** (Combustion) বলে।

ম্যাগনেসিয়ামের দহন

পরীক্ষা—একটি ছোট বাটির (ঘ) মধ্যে খানিকটা ম্যাগ্‌নেসিয়াম-গুঁড়া বা তার (wire) ওজন করিয়া রাখ। বাটিটি একটি বৃহৎ জলপাত্রে (গ) ভাসাইয়া দাও। বাটির উপর একটি ছিপিযুক্ত বড় কাচপাত্র (খ) চাপা দাও। দেখ, কাচপাত্রের ভিতরের ও বাহিরের জল একই তলে (level) আছে। এখন ছিপি (ক) খুলিয়া একটি জ্বলন্ত পাট্‌কাটি দিয়া ম্যাগ্‌নেসিয়াম-গুঁড়া স্পর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ ছিপি বন্ধ করিয়া দাও। দেখিবে মাগ্‌নেসিয়াম খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকে। একটু পরে বাটিতে সাদা **ছাই** পড়িয়া থাকে। ছাইকে ওজন কর। এই ওজন মাগ্‌নেসিয়ামের গুঁড়ার ওজনের চেয়ে বেশী হয়। ছাইকে আর জ্বালান যায় না।
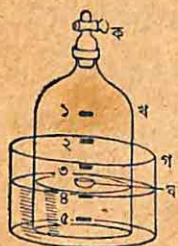
৩৩নং চিত্র—
ম্যাগ্‌নেসিয়ামের দহন

ম্যাগ্‌নেসিয়ামের সঙ্গে কাচপাত্রের ভিতরকার বাতাসের অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে সাদা ছাই উৎপন্ন হয়। সুতরাং নূতন পদার্থের ওজন বেশী হয়। **সাদা ছাই = ম্যাগনেসিয়াম + অক্সিজেন।**

ম্যাগ্‌নেসিয়াম জ্বলার পর কাচপাত্রের ভিতর জল একটু উপরে উঠে। কেন এরূপ হয় বলত? অক্সিজেন বাতাসের মধ্যে গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। ম্যাগনেসিয়ামের সহিত যুক্ত হইলে ইহা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে না। কাচপাত্রের মধ্যেকার বাতাসে অক্সিজেনের স্থান শূন্য হয়। পৃথিবীতে কোন জায়গাই শূন্য থাকে না। এই শূন্য স্থান জল অধিকার করে। কাজেই **জলযতটুকু স্থান (পাঁচ ভাগের এক ভাগ) উপরে উঠিয়া যায় বাতাসে ততটুকু স্থানে অক্সিজেন ছিল বুঝিতে হইবে।**

বাতির দহন

পরীক্ষা (১)—একটি জ্বলন্ত বাতির শিখার উপর একটি ঠাণ্ডা ও শুষ্ক গ্লাস উপুড় করিয়া ধর। কিছুক্ষণ পরে গ্লাসের গায়ে **ফোঁটা ফোঁটা** জল গড়াইতে দেখা যায় (৩৪নং চিত্র)।

৩৪নং চিত্র—বাতির দহন।

পরীক্ষা (২)—একটি জ্বলন্ত বাতিকে তামার তারে জড়াইয়া উহা একটি লম্বা কাচের চোঙের মধ্যে রাখিয়া চোঙটি ঢাকা দাও। কিছুক্ষণ পরে বাতির শিখা ছোট

হইতে হইতে একেবারে নিভিয়া যায়। চোঙের ভিতর গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল দেখা যায়। চোঙের ঢাকা তুলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ উহার ভিতর আর একটি জ্বলন্ত বাতি ঢুকাইলে উহাও নিভিয়া যায়। চোঙের ভিতর পরিষ্কার **চূণের জল** ঢালিয়া চোঙটি নাড়িয়া দাও। উহা **ঘোলাটে** হইয়া যায় (৩৫নং চিত্র)।
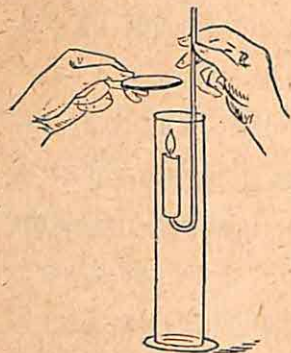
৩৫নং চিত্র—বাতির দহন।

পরীক্ষা (৩)—একটি ছোট টিনের চাক্তির উপর দুইটি জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া চাক্তিটি বড় জলপূর্ণ পাত্রে ভাসাইয়া দাও। এই দুইটি বাতির উপর একটি বড় বোতল ঢাকা দাও। প্রথমে বোতলের বাহিরের ও ভিতরের জলের তল (ক) একই থাকে। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে
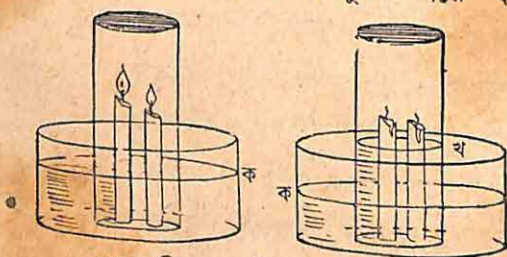
৩৬নং চিত্র—বাতির দহন পরীক্ষা।

বাতি নিভিয়া যায়। বোতলের ভিতর জল কিছুদূর উপরে উঠে (৩৬নং চিত্র খ)।

এই তিনটি পরীক্ষার শিক্ষা—বাতিতে হাইড্রোজেন ও অঙ্গার (Carbon) নামক দুইটি পদার্থ যৌগিক অবস্থায় আছে। দহনের সময় বাতির হাইড্রোজেন ও বাতাসের অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হওয়ায় নূতন যৌগিক পদার্থ **জল** উৎপন্ন হয়। জল ১নং পরীক্ষায় গ্লাসের ও ২নং পরীক্ষায় চোঙের গায়ে দেখা যায়। অঙ্গার ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে নূতন যৌগিক পদার্থ **অঙ্গারাম্ল গ্যাস** (Carbon Dioxide) উৎপন্ন হয়। এই অঙ্গারাম্ল ২নং পরীক্ষায় চূণের জল ঘোলাটে করে।

বাতাসের মধ্যে অক্সিজেনই দহনের সাহায্য করে। সেইজন্য ২নং পরীক্ষায় চোঙের মধ্যে অক্সিজেন ফুরাইলে বাতি নিভিয়া যায়। ইহার পর বাতাসের যে অংশ বাকি থাকে, তাহা বাতির দহনের সাহায্য করে না। ইহাকে **নাইট্রোজেন** বলে। ৩নং পরীক্ষায় জল উপরে উঠিয়া অক্সিজেনের শূন্য স্থান দখল করে। এইরূপ তৈল, কাগজ, কাঠ পুড়িলে একই দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং,

অঙ্গার + হাইড্রোজেন = বাতি।

অঙ্গার + অক্সিজেন = অঙ্গারাম্ল (গ্যাস)।

হাইড্রোজেন + অক্সিজেন = জল।

শ্বাসকার্য্য ও দহন—আমাদের শরীরের ভিতরও এইরূপ দহন-কার্য্য অতি ধীরে ধীরে চলিতেছে। বাতির মত আমাদের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন থাকে।

প্রশ্বাসের সঙ্গে আমরা বাতাসের অক্সিজেন লই। এই অক্সিজেন খাদ্যদ্রব্যের অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া অঙ্গারাম্ল ও জল উৎপন্ন করে। অক্সিজেন বিশুদ্ধ পদার্থ। উহা আমাদের উপকার করে কিন্তু অঙ্গারাম্ল গ্যাস দূষিত পদার্থ। উহা আমাদের অপকার করে। নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় অঙ্গারাম্ল বাহির হইয়া আসে।

পরীক্ষা—একটি গ্লাসে পরিষ্কার স্বচ্ছ চূণের জল লও। একটি কাচনলের এক প্রান্ত চূণের জলের মধ্যে রাখিয়া অপর প্রান্তে মুখ দিয়া ফুঁ দাও। নিঃশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গারাম্ল বাহির হইয়া চূণের জলকে ঘোলা করে।

আমাদের দেহের মধ্যে বাতির মত দ্রুত দহন হয় না। ইহাতে সামান্য তাপ উৎপন্ন হয় এবং এই তাপ আমাদের দেহের তাপ রক্ষা করে এবং কার্য্য করিবার শক্তি দেয়। বায়ুর অক্সিজেন ব্যতীত যেমন বাতি নিভিয়া যায় তেমন বায়ুর অক্সিজেন ব্যতীত আমাদের খাদ্য শরীর ধারণের উপযোগী হয় না, এবং আমরা মরিয়া যাই। এইজন্য জীবনকে প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বাতির দহনের মত দেহের ভিতরে আলো উৎপন্ন হয় না। উদ্ভিদও জীবন রক্ষার জন্য অক্সিজেন লয় ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস পরিত্যাগ করে।

৩৭নং চিত্র।

মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের তুলনা

মিশ্র পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
১। উপাদানের স্বকীয় ধর্ম্ম বজায় থাকে।	১। উপাদানের স্বকীয় ধর্ম্ম বজায় থাকে না।
২। উপাদান যে কোনও ভাগে বর্ত্তমান থাকিতে পারে।	২। উপাদান নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে।
৩। উপাদানগুলি সাধারণ প্রণালীতে পৃথক করা যায়।	৩। উপাদানগুলি সাধারণ প্রণালীতে পৃথক করা যায় না।
৪। উপাদানগুলি মিশাইলে তাপের তারতম্য হয় না।	৪। উপাদানগুলি মিশাইলে তাপের তারতম্য হয়।

সারাংশ—দহনের সময় পদার্থের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হয় এবং আলো ও তাপের সৃষ্টি হয়। ম্যাগনেসিয়ামের দহনের পর ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড প্রস্তুত হয় ও উজ্জল আলো হয়। বাতির দহনের সময় অঙ্গারাম্ল ও জল উৎপন্ন হয়। বাতাসের মধ্যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আছে। অক্সিজেন দহনের সাহায্য করে। শ্বাসকার্য্যের দ্বারা বাতাসের অক্সিজেনের সহিত খাদ্যদ্রব্যের অঙ্গার ও হাইড্রোজেন মিলিত হইয়া অঙ্গারাম্ল ও জল উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন

১। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ কাহাকে বলে? জল যে যৌগিক পদার্থ তাহা কি করিয়া প্রমাণ করিবে?

৩। দহন কাহাকে বলে ? কি ও কেন হয় বল :—একটি জ্বলন্ত বাতির শিখার উপর যদি একটা কাচের গ্লাস ধরা হয়। একটি চোঙের ভিতর বাতি জ্বালিয়া চোঙ্ ঢাকা দিয়া পরে যদি উহাতে চূণের জল ঢালা হয়।

২। ম্যাগ্নেসিয়াম ও বাতির দহন হইতে কি করিয়া প্রমাণ করিবে যে, দহনের সময় অক্সিজেনের দরকার হয় ?

চতুর্থ অধ্যায়

মরিচা

পরীক্ষা—কতকগুলি শুষ্ক চক্চকে লোহার গুঁড়ার ওজন কর; এক টুক্রা পাতলা কাপড়ে করিয়া ইহাদিগকে একটি কাচনলের সহিত বাঁধ। কাপড়ে অল্প জল দাও। কাপড়ের থলিটি সমেত কাচনলটিকে একটি বোতলের মধ্যে রাখিয়া বোতলটি একটি জলপূর্ণ পাত্রে উপুড় করিয়া দাও।
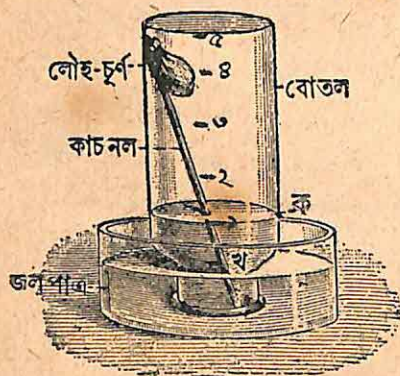
৩৮নং চিত্র—মরিচা গঠন।

প্রথমে বোতলের বাহিরে ও ভিতরে জল একই তলে (খ) থাকে। কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, ভিতরের জল একটু উপরে উঠিয়াছে (ক)। ইহার পর আরও কিছুদিন এই

অবস্থায় রাখিলে জল আর উপরে উঠে না। ভিতরে জল কত উপরে উঠিয়াছে তাহা মাপিলে দেখিবে যে, বোতলের বায়ুপূর্ণ অংশের এক-পঞ্চমাংশ জলে ভরিয়া গিয়াছে। এখন বোতলটির মুখে ঢাক্‌নি দিয়া উহা উল্‌টাইয়া রাখ এবং উহার ভিতরে একটি জ্বলন্ত বাতি ঢুকাইয়া দাও। উহা তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে। থলি হইতে লোহার গুঁড়া খুলিয়া লও। দেখ, উহাদের কতকগুলি চক্‌চকে আছে আর কতকগুলি লাল্‌চে হইয়াছে। লাল্‌চে অংশ হইল মরিচা। সমস্ত লোহার গুঁড়া শুকনা করিয়া পুনরায় ওজন কর। দেখ, ওজন বাড়িয়াছে।

এই পরীক্ষা হইতে কি শিক্ষা করিলে ? বায়ু প্রধাণতঃ দুইটি গ্যাসের **মিশ্র পদার্থ**। **বায়ুর অক্সিজেন ও ন্যাকড়ার জল লোহার গুঁড়ার সহিত যুক্ত হইয়া মরিচা উৎপন্ন করে।** বায়ুর অক্সিজেন লোহার সহিত যুক্ত হইয়া যাওয়ায় তাহার স্থান শূন্য হয়। জল এই শূন্য স্থান দখল করে। বোতলের বায়ুর যতটুকু অংশ জলে ভরিয়া যায় উহাই হইল বায়ুতে অক্সিজেনের আয়তন। **বায়ুর এক পঞ্চমাংশ হইল অক্সিজেন।** বায়ুর অবশিষ্ট $\frac{4}{5}$ অংশ মরিচা উৎপাদনে বা দহনে সাহায্য করে না। ইহা নিষ্ক্রিয় অংশ। ইহা হইল **নাইট্রোজেন**। ইহাতে জ্বলন্ত বাতি প্রবেশ করাইয়া দিলে উহা নিভিয়া যায়। লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ হয় বলিয়া মরিচার ওজন বাড়িয়া যায়। লোহা ও মরিচা একই জিনিষ নহে।

মরিচার জন্য জল ও বায়ু দুইই দরকার। লোহা বদ্ধ

পাত্রে ফুটন্ত জলের মধ্যে রাখিলে তাহাতে মরিচা পড়ে না, কারণ ফুটন্ত জলে বাতাস থাকে না। আবার কতকগুলি শুষ্ক লোহাচুর একটি শুষ্ক পাত্রে রাখিয়া দাও। জলীয় বাষ্পের অভাবে উহাতে মরিচা পড়িবে না। বাতাসে সব সময়ে জলীয় বাষ্প থাকে বলিয়া লোহার গরাদে, কড়ি ও বরগায় মরিচা লাগে। মরিচা নিবারণের জন্য লোহার জিনিষে রং বা তেল লাগাইয়া রাখা হয়।
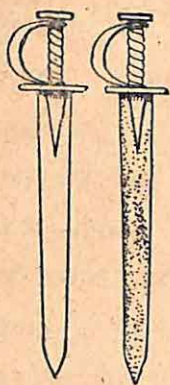
৩৯নং চিত্র—বামদিকের তরবারিতে তেল লাগান আছে বলিয়া চক্‌চক্ করিতেছে।
ডানদিকের তরবারিতে মরিচা পড়িয়াছে।

সারাংশ—লোহা, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগে **মরিচা** উৎপন্ন হয়। কোন বন্ধ বোতলে আর্দ্র লোহার গুঁড়া রাখিলে লোহায় মরিচা পড়ে এবং বোতলের বাতাসের $\frac{1}{5}$ অংশ কমিয়া যায়। উহা অক্সিজেন। $\frac{4}{5}$ অংশ নাইট্রোজেন।

প্রশ্ন

১। মরিচা কাহাকে বলে? ইহা কি করিয়া উৎপন্ন হয়?

২। মরিচা হইবার সময় বায়ুর অক্সিজেনও দরকার তাহা কি করিয়া প্রমাণ করিবে?

৩। বায়ুতে যে এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন আছে তাহা কি করিয়া প্রমাণ করিবে?

৪। বায়ুর উপাদান সম্বন্ধে যাহা জান বল। (M. E. 1940)

হাতের কাজ—নিজ হাতে পরীক্ষা কর:—(১) জল ও কাদা মিশাইয়া পৃথক্ কর। (২) চিনি ও বালি একত্র মিশাইয়া পৃথক্ কর। (৩) চিনি ও জল একত্র মিশাইয়া পৃথক্ কর। (৪) কর্পূর ও বালি একত্রে মিশাইয়া পৃথক্ কর। (৫) লোহাচুর ও গন্ধক মিশাইয়া পৃথক্ কর।

উদ্ভিদ্ বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

সজীবতার লক্ষণ

যে সকল পদার্থের প্রাণ আছে তাহাদিগকে সজীব পদার্থ বলে ; যথা—পশু, পক্ষী, পোকামাকড়, মানুষ, গাছপালা। যে সকল পদার্থের প্রাণ নাই, তাহাদিগকে জড় পদার্থ বলে ; যথা—ইট, পাথর, মাটি, ঘরবাড়ী।

সজীব পদার্থের নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায় :—

(১) **খাদ্য-গ্রহণ, দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি**—সজীব পদার্থ মাত্রই আহার করিয়া দেহ পুষ্টি ও বৃদ্ধি করে। প্রাণী ও উদ্ভিদ্ উভয়েই আহারও করে আবার জলপানও করে। আহার করিয়া ছোট শিশু কত বড় মানুষ হয় ; চারা গাছ আহার করিয়া কত বড় বৃক্ষ হয়। লাউ কুমড়ার গাছ কত শীঘ্র বাড়ে। একটি কুকুর ছানাকে কয়েক দিন না খাইতে দিলে উহা মরিয়া যাইবে। শিম চারার শিকড় বা পাতা কাটিয়া দিলে উহা খাদ্যাভাবে মরিয়া যাইবে। ভুক্ত দ্রব্যের সার অংশ শরীরকে পুষ্ট করে। ইট, পাথর আহারও করে না, বা বড়ও হয় না।

(২) **শ্বাস-গ্রহণ**—সজীব পদার্থ মাত্রই বাতাস হইতে

অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড নামক অন্য একটি দূষিত গ্যাস দেহ হইতে ত্যাগ করে। ইহাকে **নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস** বলে। কুকুর ছানাকে কিংবা শিম চারাকে বদ্ধ জায়গায় রাখিয়া দিলে বায়ুর অভাবে উহারা মরিয়া যায়।

সজীব পদার্থের দেহের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের সহিত বাতাসের অক্সিজেনের সংযোগ হয়। ইহাতে তাপ ও অন্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তাপ হইতে আমরা কাজ করিবার শক্তি পাই। অতএব, **সকল সজীব পদার্থের বাঁচিবার জন্য বাতাস ও খাদ্য দুই-ই দরকার।**

৩১ নং চিত্রের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে Carbon Dioxide বাহির হয়।

(৩) **গমন-শক্তি ও নড়াচড়া**—প্রত্যেক প্রাণীকে কোন না কোন কারণে নড়াচড়া করিতে হয়। গরু, ভেড়া, ছাগল সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কচি ঘাস-পাতা খাইয়া বেড়ায়। আমরা সকল সময়ই হাত পা নাড়িয়া কাজকর্ম্ম করিতেছি। মানুষ, গরু, ভেড়া পা দিয়া চলে, পাখী পাখা দিয়া বাতাসে উড়ে, মাছ পাখ্না দিয়া জলে সাঁতার দেয় ; সাপ, কেঁচো বুক দিয়া মাটিতে চলে।

উদ্ভিদ প্রাণীর মত চলিতে পারে না কিন্তু গাছপালার দেহের বিভিন্ন অংশ নড়াচড়া করে। লতানে গাছ, যথা—কুমড়া, পটল গাছ লতিয়ে লতিয়ে চলে। কতকগুলি গাছ, যথা—শিম, অপরাজিতা অন্য গাছকে জড়াইয়া চলে।

জড়পদার্থ নিজ হইতে নড়িতে পারে না। ইটকে না নাড়াইলে ইট এক জায়গায় থাকে।

(৪) **উত্তেজনায় সাড়া**—আমাদের চোখ আলোয় সাড়া দেয়, কাণ শব্দে সাড়া দেয়, চামড়া স্পর্শে সাড়া দেয়। আমরা শীত ও তাপ অনুভব করি। কেন্নুইকে ছুঁইলে উহা কুণ্ডলী পাকাইয়া যায়। আরশুলার শুঙ্গে হাত দিলে উহা পলাইয়া যায়। এইরূপ প্রাণীমাত্রই কোন না কোন উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

গাছপালারও উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আছে। কাণ্ড আলোয় সাড়া দেয়; শিকড় অন্ধকারে সাড়া দেয়।

পরীক্ষা—কতকগুলি অঙ্কুরিত সরিষা-বীজ একটি টবে

৪০নং চিত্র—কাণ্ডের আলোয় সাড়া ও শিকড়ের অন্ধকারে সাড়া।

করিয়া অন্ধকার ঘরে একটি জানালার নিকট রাখ। দেখ সরিষার গাছ সব সোজা হইয়া উঠিয়াছে। জানালাটি খুলিয়া দাও। ২।৩ দিন পরে দেখ, গাছগুলির মাথা জানালার আলোর দিকে ঝুঁকিয়াছে। (৪০ নং চিত্র ক)

পরীক্ষা—একটি অঙ্কুরিত মটর-বীজ টেবিলের মাঝখানের

করাতের গুঁড়ার মধ্যে রাখ। কয়েক দিন পরে দেখ, মটরের শিকড় টেবিলের গা বাহিয়া নীচের দিকে নামিতেছে এবং কাণ্ড বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে।

(৪০ নং চিত্র খ)

লজ্জাবতীর ছড়ান পাতা স্পর্শ করিলে গুটাইয়া যায়। অনেক উদ্ভিদ্ই রাত্রে পাতা মুড়িয়া ঘুমায়; যথা—কৃষ্ণচুড়া, তেঁতুল।

৪১নং চিত্র—লজ্জাবতী পাতা

(৫) জন্ম ও মৃত্যু—সজীব পদার্থ মাত্রই জন্মায়, কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিয়া মরিয়া যায়। মৃত্যুর পর জীবের দেহ জড় পদার্থ হইয়া যায়। সজীব পদার্থের আয়ুর কোন ঠিক নাই। মানুষ বাঁচে আশী-নব্বই বৎসর , কোন গাছ এক বৎসর বাঁচে, কোন গাছ হাজার দু'হাজার বৎসর বাঁচে।

(৬) **বংশ রক্ষা**—জীবমাত্রই নানা উপায়ে বংশ রক্ষা করে। প্রাণিগণ সন্তান প্রসব কয়িয়া বা ডিম পাড়িয়া, অধিকাংশ উদ্ভিদ বীজ ধারণ করিয়া, কতকগুলি উদ্ভিদ্ পাতা বা মুখী বা ডাল বা শিকড় দিয়া বংশ রক্ষা করে।

(৭) **চারিদিকের অবস্থার সহিত মানাইয়া**

চলা—চারিদিকের প্রাকৃতিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন দেশের মানুষের পোষাক ও আহার পৃথক হয়।

স্থলের প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠন জলের প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠন হইতে বিভিন্ন। জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুলিলে মরিয়া যায়। একটি কুকুর ছানাকে জলে ডুবাইলে সে দম আটকাইয়া মরিয়া যায়। জলে ব্যাঙাচি লেজ দিয়া সাঁতার দেয়, ফুল্‌কা দিয়া নিঃশ্বাস লয়। পরে ইহা যখন ব্যাঙ্‌ হয় তখন ইহার ডাঙ্গায় হাঁটিবার জন্য পা গজায় ও নিঃশ্বাস লইবার জন্য ফুস্‌ফুস্‌ হয়। মরুভূমির প্রাণী উটের পিঠে জল জমা করিবার থলি থাকে।

জলজ উদ্ভিদের গায়ে অনেক বায়ুপূর্ণ গর্ত্ত থাকে। ইহাতে জলজ উদ্ভিদ জলে ভাসিতে পারে ও শ্বাস লইতে পারে।

(৮) **আত্মরক্ষা**—প্রাণিগণ নখ, থাবা, হুল, শিং, হাত, পা, কাঁটা ইত্যাদির সাহায্যে শত্রুর হাত হইতে নিজেদের বাঁচায়। বিড়াল নখ দিয়া আঁচড়ায়; ঘোড়া পা দিয়া লাথি মারে; কুকুর দাঁত দিয়া কামড়ায়; গরু মহিষ শিং দিয়া গুঁতাইয়া দেয়; ভীমরুল ও বোলতা হুল ফুটাইয়া দেয়।

উদ্ভিদের মধ্যে গোলাপ, কুল, বেল, বাবলা গাছ প্রভৃতি বড় গাছ তাহাদের বড় **কাঁটা** দিয়া; কাটানটে, শিয়ালকাটা কুলেখাড়া প্রভৃতি ছোট গাছ তাহাদের **উর্দ্ধমুখী কাঁটা** দিয়া; পুদিনা, গাঁদাল, দ্রোণ ও ধনিয়া তাহাদের **দুর্গন্ধ** দিয়া; নিম, উচ্ছে, নিশিন্দে তাহাদের **বিস্বাদ রস** দিয়া; রাঙচিতা, ধতুরা, আকন্দ ও ভেরেণ্ডা তাহাদের **বিষাক্ত রস** দিয়া গবাদি পশুর

হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করে। বিছুটি ও আলকুলী গাছের পাতায় ও কোমল শাখায় **বিষাক্ত রসপূর্ণ শুঁয়া** থাকে। কোন জন্তু ইহাদিগকে স্পর্শমাত্রই শুঁয়া জন্তুর দেহে বিদ্ধ হয় এবং শুঁয়ার বিষাক্ত রস দেহময় ছড়াইয়া পড়ে। কোন জন্তুই এই সকল গাছ স্পর্শ করে না। কচু, ওল গাছের ভিতরে সূঁচের মত বহু বিষাক্ত দানা আছে। ইহা খাইলে মুখে যন্ত্রণা হয়। আম, জাম, কাঁঠাল স্থূল, ত্বক দ্বারা শীত ও উত্তাপ হইতে রক্ষা পায়।

সারাংশঃ—জীব ও জড়ের তুলনা

জড়	জীব
১। জড় খাদ্য গ্রহণ, দেহ পুষ্টিও বৃদ্ধি করিতে পারে না।	১। জীব খাদ্য গ্রহণ, দেহ পুষ্টি ও বৃদ্ধি করিতে পারে।
২। জড় পদার্থের নিজেদের নাড়াচড়ার শক্তি নাই।	২। সকল প্রাণীই চলিতে পারে। উদ্ভিদ্ নড়াচড়া করে।
৩। জড় উত্তেজনায় সাড়া দেয় না।	৩। জীব উত্তেজনায় সাড়া দেয়।
৪। জড়ের শ্বাসকার্য্য বলিয়া কিছুই নাই।	৪। জীবের শ্বাসকার্য্য আছে।
৫। জড় বংশ বৃদ্ধি করে না।	৫। জীব বংশ বৃদ্ধি করে।
৬। জড়ের জন্ম ও মৃত্যু নাই।	৬। জীবের জন্ম-মৃত্যু আছে।
৭। জড় আত্মরক্ষা করিতে পারে না।	৭। জীব আত্মরক্ষা করিতে পারে।

প্রশ্ন

১। জীবনের লক্ষণ কি কি ? জীব ও জড়ের পার্থক্য কি ?
(M. E. 1940)

২। আমরা কাজ করিবার শক্তি পাই কি করিয়া ? উদ্ভিদের দেহে যে কার্ব্বন-ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় তাহা কি করিয়া প্রমাণ করিবে ?

৩। জীবনমাত্রই যে উত্তেজনায় সাড়া দেয় তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। কাণ্ড যে আলো চাহে এবং শিকড় যে অন্ধকার চাহে তাহা পরীক্ষা দ্বারা বুঝাও।

৪। প্রাণী ও উদ্ভিদের নিজেদের বাঁচাইবার উপায়গুলি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। (M. E. 1939 '41)

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর বিশেষত্ব

তোমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে জীব ও জড়ের পার্থক্য দেখিয়াছ। নিম্নে **উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য** দেওয়া হইল।

(১) উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র কোষ (cell) দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক কোষের মধ্যস্থলে **নিউক্লিয়াস** নামক পদার্থ ও নিউক্লিয়াসকে ঘিরিয়া **প্রোটোপ্লাজম্** নামক পদার্থ আছে। অতি ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর দেহে একটি মাত্র কোষ

থাকে। প্রাণীর কোষের চারিধারে কোষপ্রাচীর নাই। উদ্ভিদের কোষের এইরূপ প্রাচীর আছে।

৪২ নং চিত্র উদ্ভিদ্ কোষ।

(২) উদ্ভিদের সবুজ অংশ সূর্য্যের আলোর সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করে। কিন্তু প্রাণী হয় উদ্ভিদ্-জাত খাদ্য গ্রহণ করে, না হয় উদ্ভিদ্‌ভোজী পশুর মাংস খায়। বাঘ ছাগলের মাংস খায় ; আবার ছাগল তৃণ খায়। প্রাণী খাদ্য হজম করিতে পারে কিন্তু প্রস্তুত করিতে পারে না।

(৩) প্রায় সকল প্রাণীই মুখ দিয়া আহার করে। উদ্ভিদের মুখ নাই। ইহারা শিকড় দিয়া মাটি হইতে এবং সবুজ অংশ দিয়া সূর্য্যের আলোর সাহায্যে বাতাস হইতে খাবার খায়। উদ্ভিদ্ কখনও কঠিন খাদ্য গ্রহণ করে না, কেবল তরল খাদ্য খায়। প্রাণী তরল ও কঠিন খাদ্য খাইতে পারে।

(৪) অধিকাংশ প্রাণী নাক ও ফুস্‌ফুস্ দিয়া বাতাস লয়। উদ্ভিদ্ দেহের বিশেষতঃ পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বাতাস লয়।

পরীক্ষা—একটি জলপূর্ণ বড় পাত্রে একটি জলপূর্ণ গ্লাস উপুড় করিয়া রাখ। একটি ডাঁটাযুক্ত পাতা লইয়া ডাঁটার শেষ

অংশ গ্লাসের জলে ঢুকাইয়া দাও। পাতার ছিদ্র ও ডাঁটার নালী দিয়া বাহিরের বাতাস গ্লাসে জমে ; জল নীচে সরিয়া যায়। পাতাটি জলের মধ্যে ডুবাইলে পাতার ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়। বাতাস পাতার মধ্যে ঢুকিতে পারে না।

৪৫নং চিত্র পাতার শ্বাস।

(৫) উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও নূতন পত্র ধারণ সারা জীবন ধরিয়া চলে। লাউ, কুমড়া গাছ খুব শীঘ্রই বাড়ে। পেঁপে ও কদম গাছও শীঘ্র বাড়ে ; আম, তাল, নারিকেল ধীরে ধীরে বাড়ে। জাপানে এক রকম গাছ আছে তাহা এক শত বৎসরেও এক ফুট উচ্চ হয় না। প্রাণীদের বৃদ্ধি কিছুদিন বন্ধ হইয়া যায়।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর তুলনা

প্রাণী	উদ্ভিদ্
১। দেহকোষে প্রাচীর নাই।	১। দেহকোষে প্রাচীর আছে।
২। জন্ম, আহার গ্রহণ, দেহ পুষ্টি ও বৃদ্ধি, মৃত্যু হয়।	২। জন্ম, আহার গ্রহণ, দেহ পুষ্টি ও বৃদ্ধি, মৃত্যু হয়।
৩। মুখ দিয়া তরল ও কঠিন পদার্থ আহার করে।	৩। শিকড় ও পাতা দিয়া তরল পদার্থ ও Carbon Dioxide আহার করে।
৪। বাতাসের Carbon Dioxide হইতে অঙ্গার গ্রহণ করিতে পারে না।	৪। বাতাসের Carbon Dioxide হইতে অঙ্গার গ্রহণ করিতে পারে।
৫। আহার্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে না।	৫। সবুজ উদ্ভিদ্ আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে।
৬। শ্বাসকার্য চলে।	৬। শ্বাসকার্য্য চলে।
৭। চলিতে ও নড়িতে পারে।	৭। কেবল নড়িতে পারে।

প্রশ্ন

১। উদ্ভিদ্ কি প্রণালীতে আহার করে?

২। গাছপালা কি করিয়া বাতাস টানিয়া দেহের মধ্যে লয়।

৩। উদ্ভিদের দেহ যে স্থির নহে তাহা বিভিন্ন উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সাদৃশ্য বর্ণনা কর (M. E. 1940)।

হাতের কাজ—নিজ হাতে পরীক্ষা কর—উদ্ভিদ্ পাতা দিয়া নিঃশ্বাস লয়।

তৃতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

চল, আমরা একবার বাগানে বেড়াইয়া আসি। দেখ, বাগানে কত রকমের উদ্ভিদ্ রহিয়াছে। তালগাছটি কত লম্বা মাথায় বড় পাতার টোপর পরিয়াছে, ইহার ডালপালা সরু ও কম। আম গাছটি দেখ কত মোটা ও বড় ডালপালাযুক্ত। গোলাপ, জবা, যূঁই, প্রভৃতি কত সুন্দর ফুল আছে। এই গাছগুলি কত ছোট! লাউ-কুমড়ার মত লতানে সরু গাছ দেখ, মখমলের মত নরম দূর্ব্বা ঘাস দেখ।

গোলাপ, জবা, যূঁই, আম, জাম, লিচু, লাউ-কুমড়ার গাছে ফুল,ফল ও বীজ হয়। এই সকল গাছকে **সপুষ্পক বা সজীব** গাছ বলে।

পচা গোবরের কিংবা পচা গাছপালার উপরে অনেক সময় সাদা **ব্যাঙের ছাতা** দেখা যায়। পুকুর, বিল বা চৌবাচ্চায় সবুজ পিচ্ছল **শ্যাওলা** দেখা যায়। ব্যাঙের ছাতা ও শ্যাওলা উদ্ভিদ কিন্তু ইহাদের শিকড়, কাণ্ড বা পাতা নাই। ভিজা দেওয়ালের গায়ে ঘন সবুজ বর্ণের **মস** নামক উদ্ভিদ্ জন্মায়। ইহাদের কাণ্ড ও পাতা থাকে।

ভিজে জায়গায় রকম রকম পাতাযুক্ত গাছ দেখা যায়।

ইহাদিগকে **ফার্ণ** বলে। ইহাদিগের কাণ্ড, পাতা ও মূল হয়। শুশ্নির শাখ এক প্রকার ফার্ণ।
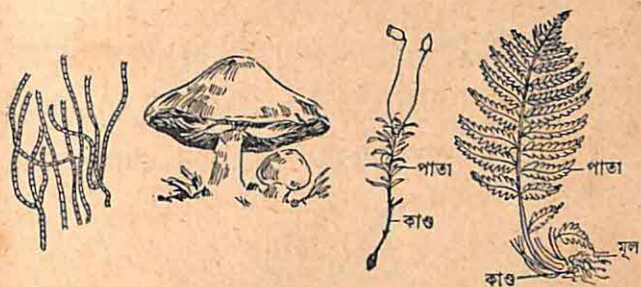
৪৪নং চিত্র—ক—শ্যাওলা, খ—ব্যাঙের ছাতা, গ—মস, ঘ—ফার্ণ,

মস, ফার্ণ, ব্যাঙের ছাতা কিংবা শ্যাওলার কখনও ফুল, ফল বা বীজ হয় না। ইহাদিগকে **অপুষ্পক** বা **অবীজ** উদ্ভিদ্ বলে।

অপুষ্পক গাছের মধ্যে যাহাদিগের বীজ ফলের মধ্যে থাকে তাহাদিগকে **আবৃত-বীজ** বলে; যথা—আম, লিচু ইত্যাদি। যাহাদিগের বীজ পাতার উপর অনাবৃতভাবে থাকে তাহাদিগকে **নগ্নবীজ** বলে ; যথা—পাইন।

প্রশ্ন

১। উদ্ভিদ্ জগতের শ্রেণী-বিভাগ কর।

২। নগ্নবীজ ও আবৃত বীজ উদ্ভিদ্ কাহাকে বলে?

চতুর্থ অধ্যায়

আম গাছের বিবরণ ও জীবন-ইতিহাস

আম গাছের বিবরণ—বাগানে যাইয়া একটি আম গাছ ভাল করিয়া পরীক্ষা কর।

কাণ্ড—দেখ, আম গাছের কাণ্ড কেমন গোল, শক্ত ও
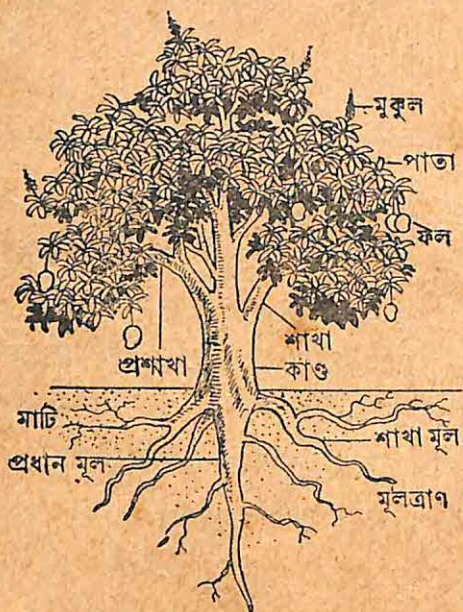
৪৫নং চিত্র—আম গাছ।

মোটা। আঁটি গাছের কাণ্ড ৩০।৪০ হাত উঁচু হয়। কলমের গাছের কাণ্ড তত উঁচু হয় না। আম গাছের **শাখা প্রশাখা**

বাহির হইয়াছে দেখ। চারা গাছের ছালের রং সবুজ। বড় গাছ ছাই রংঙের একটি মোটা ছালে ঢাকা থাকে। গাছ বড় হইলে ছাল ফাটিয়া যায়। আমগাছের কাণ্ড চারিদিকে বাড়ে। পাতা সমেত গাছের উপরটা ঝোপের মত দেখায়। আম গাছের একটি ডাল কাটিয়া দেখ—বাহিরে ছাল, ছালের পর শক্ত কাঠ, কাঠের পর **মাজ** রহিয়াছে। কাঠের গায়ে পর পর চাকার মত দাগ আছে।

মূল—একটি আমের চারা গাছ উপড়াও। দেখ, ইহার

৪৬নং চিত্র—আমের চারা, পাতা ও আম।

প্রধান মুল আছে এবং ইহা হইতে অনেক **শাখামুল** বাহির হইয়াছে। মূলের আগায় **মূলত্রাণ** ও গায়ে **মুলরোম** আছে। আম গাছ খুব বড় হয় বলিয়া ইহার মুল লম্বা ও শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয়।

পাতা—একটি আমের পাতা পরীক্ষা কর। দেখ,

পাতায় একটি মাত্র বল্লমাকৃতি **ফলক** আছে। ফলকের উপরটা ঘোর সবুজ ও চক্‌চকে। নীচের দিক ফিকে সবুজ ও খসখসে। ফলকের কিনারা একটানা, আগা সূঁচাল। পাতাগুলি শক্ত, সরস ও পাতলা। আম গাছও কখন পত্রশূন্য হয় না।

একটি আমপাতা রৌদ্রে ধরিলে ফলকের মধ্যখানে একটি মোটা শিরা ও তাহার পাশ দিয়া পাখীর পালকের মত ছোট শিরা বাহির হইতে দেখিবে। ইহাকে **পক্ষশিরা** বলে।

ফুল—মাঘ-ফাল্গুন মাসে আম গাছে ছোট ছোট **মুকুল** বা বোল হয়। অনেক মুকুল লইয়া এক একটি **মঞ্জরী** হয়। প্রত্যেক ফুলে পাঁচটি পৃথক সাদা **কুণ্ড** এবং পাঁচটি হলদে রঙের **পাঁপড়ি** সাজান আছে। প্রত্যেক ফুলে পাঁচটি **পুংকেশর** এবং মাঝখানে একটি **মাতৃকেশর** আছে। ঠিক মাতৃকেশরের চারিদিকে চারিটি গোলাকার **মধুকোষ** আছে।
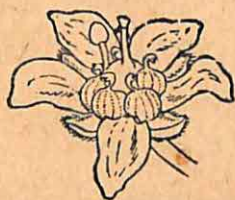
৪৭নং চিত্র—আমের ফুল।

ফল—মঞ্জরীর প্রত্যেক বোল হইতে ক্ষুদ্র ফল বাহির হয়। ইহাকে **গুটি** বলে। কেবল তিন চারটা গুটিতে আম ফলে, বাকি গুটি ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

একটি আম লইয়া পরীক্ষা কর। ইহার উপর **খোসা** (ক) মধ্যখানে **শাঁস** (খ), সকলের ভিতরে একটি **আঁটি** (গ) দেখিতে পাইবে (৪৮নং চিত্র)। আঁটির মধ্যে **বীজ** (ঘ) থাকে।

ফলটি বোঁটা দিয়া গাছের সহিত যুক্ত থাকে। আম অতি সুস্বাদু ফল।

৪৮নং চিত্র—আম

জীবন-ইতিহাস—গাছের জীবনের মুল ঘটনাগুলি চারি পর্য্যায় বিভক্ত, যথা—(ক) বীজ অবস্থা, (খ) চারা অবস্থা, (গ) পরিণত অবস্থা বা গাছের বৃদ্ধি (ঘ) ফুল ও ফল ধারণ, (ঙ) বংশ রক্ষা।
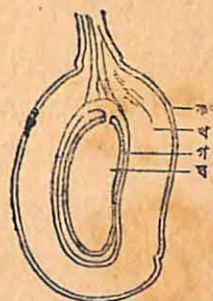
(ক) **বীজ অবস্থা**—আঁটির ভিতর ফলের বিভিন্ন অংশ। বীজের পাতলা খোসা দিয়া **ভ্রূণ** আবৃত থাকে। ভ্রূণে দুইটি মোটা সাদা **বীজপত্র** থাকে (৪৯নং চিত্র)। বীজপত্রে চারা গাছের খাদ্য থাকে।

৪৯নং চিত্র—বীজপত্র ও ভ্রূণ।

(খ) **চারা অবস্থা**—আষাঢ় মাসে ভিজা মাটিতে আঁটি পুঁতিলে প্রথমে ভ্রূণ-মূল পরে ভ্রূণ-কাণ্ড বাহির হয়। 'কলম' করিয়াও আমগাছ উৎপন্ন হয়।

(গ) **গাছের বৃদ্ধি**—মূল ও কাণ্ড ক্রমশঃ বড় হয় এবং উহাদের শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। ডালপালা হইতে পাতা

গজায় ; পাতায় খাদ্য প্রস্তুত হয়। পাতা ঝরিয়া পড়ে, নূতন পাতা হয়।

(ঘ) **ফুল ও ফল ধারণ**—প্রায় পাঁচ ছয় বৎসরে গাছ বড় ও সবল হয়। গাছে ফুল হয়। মৌমাছিরা পরাগ ও গর্ভকেশরের সংযোগ ঘটায় ; ইহাতে ফল ও বীজ হয়। বীজ হইতে বংশ রক্ষা হয়।

আম নানা প্রকারের হয়, যথা—ল্যাংড়া, ফজলি, গোলাপ-ভোগ প্রভৃতি। ফজ্‌লি আম আকারে সকলের চেয়ে বড়।

মাঘ-ফাল্গুন মাসে আমের বোল হয়, চৈত্র-বৈশাখ মাসে গুটি হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আম পাকে।

প্রশ্ন

১। একটি আম গাছের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর।

২। আমের পাতা, ফুলের বর্ণনা কর।

৩। পরিচিত একটি গাছের গঠন ও জীবন-ইতিহাস লিখ। (M. E. 1939)

হাতের কাজ—একটি আম গাছের সম্পুর্ণ ছবি আঁক। ইহার বিভিন্ন অংশ দেখাও।

পঞ্চম অধ্যায়

ছোলার বীজ-অঙ্কুরণ

ছোলার বীজ পরীক্ষা—দেখ, ছোলার বীজের উপরে বাদামি রঙের **খোসা** আছে। বীজের খোসার উপর একটি দাগ দেখিবে। দাগের উপরে খোসার একটি গর্ত্ত দেখিবে। ইহাকে **ডিম্বকরন্ধ্র** (ছিদ্র বলে)। এই গর্ত্ত দিয়া অঙ্কুরের মূল বাহির হয়।

ভিজা ছোলার খোসা ছাড়াইয়া ফেল। ভিতরে একটি হলদে
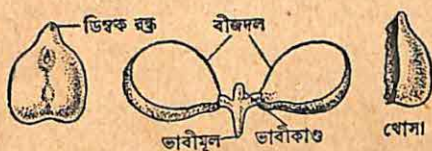
৫০নং চিত্র—ছোলার বীজের বিভিন্ন অংশ

গোলাকার **পদার্থ** দেখিতে পাইবে। ইহাকে **ভ্রূণ** বলে। ইহারা মাঝখানে চেরা। আঙ্গুলের একটু চাপ দিলে ইহা দুই ভাগ হইয়া যাইবে। এই দুই ভাগকে **বীজদল** বা **বীজপত্র** বলে। ছোলার ডালই বীজপত্র। একটি ক্ষুদ্র সাদা দণ্ড ইহাদিগকে কব্জার মত জুড়িয়া রাখিয়াছে। দণ্ডের বাহিরের সরু অগ্রভাগকে **ভাবীমূল** এবং মোটা ও বাঁকা অগ্রভাগকে **ভাবীকাণ্ড** বলে। বীজপত্রে শিশু-উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চিত থাকে। ছোলার মত

যে সকল গাছের বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে তাহাদিগকে **দ্বিবীজপত্রী গাছ** বলে।

ছোলা বীজের অঙ্কুরণ—অঙ্কুরণের জন্য উপযুক্ত **জল বাতাস ও তাপ** দরকার। জল বাতাস বা তাপের মধ্যে একটির অভাব হইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

পরীক্ষা—একটি বড় কাঁচের গেলাস অর্দ্ধেক জলে ভর্ত্তি কর। একখণ্ড কাঠ লইয়া মোম দিয়া আবৃত কর। ইহার উপর তিনটি ছোলার বীজ পিন দিয়া এমনভাবে আঁটিয়া দাও যাহাতে কাষ্ঠখণ্ডকে গ্লাসের জলের ভিতর রাখিলে প্রথম বীজটি একেবারে জলের ভিতরে, দ্বিতীয় বীজটি অর্দ্ধেক জলে ও অর্দ্ধেক বাতাসে এবং তৃতীয় বীজটি সম্পুর্ণ জলের বাহিরে থাকে। দুই-তিন দিন পরে দেখ, দ্বিতীয় বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়াছে, কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয় নাই। ইহার কারণ প্রথম বীজ বাতাস পায় নাই, তৃতীয় বীজ জল পায় নাই দ্বিতীয় বীজ বাতাস ও জল দুই-ই পাইয়াছে।
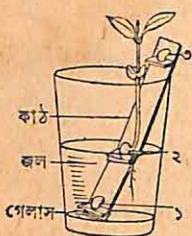
৫১নং চিত্র—অঙ্কুরণে বাতাস, তাপ ও জল চাই

পরীক্ষা—শুক্‌না ও গুঁড়া কিম্বা শক্ত ও ভিজা কিংবা খুব শীতল মাটিতে ছোলার বীজ ছড়াইয়া দাও, অঙ্কুর বাহির হইবে না। কারণ, শুক্‌না মাটিতে জলের অভাব, শক্ত মাটিতে বাতাসের অভাব, শীতল মাটিতে তাপের অভাব।

অতএব দুই পরীক্ষা হইতে দেখা যায় যে, অঙ্কুরণের জন্য জল, বাতাস ও তাপ দরকার।

জল, বাতাস ও তাপের দরকার কেন বল ত'? জল বীজপত্রের খাদ্যকে তরল করে এবং বীজের খোসাকে নরম করে। ভ্রূণের নিঃশ্বাস লওয়া দরকার। তাই মাটি শক্ত বা শুক্‌না হইলে শিশু গাছ বাতাস পায় না।

অঙ্কুরণের জন্য আলো দরকার হয় না। সেইজন্য বীজ পুঁতিলে মাটি চাপা দিতে হয়। কিন্তু গাছের বৃদ্ধির জন্য আলো দরকার।

প্রথমে ভাবীমূল মাটির নীচে যায়। পরে ভাবী-কাণ্ড মাটির উপর বাহিরে আসে। বীজপত্র কাণ্ডের সহিত মাটির বাহিরে আসে, পরে শুকাইয়া যায়। ভাবীমূল **প্রধান মূলে** পরিণত হয় এবং প্রধান মূল হইতে অনেক **শাখামূল** বহির হয়। মটর, শিম, আম প্রভৃতি দ্বি-বীজপত্রী গাছের অঙ্কুরণ-প্রণালী ছোলার অঙ্কুরণের মত।
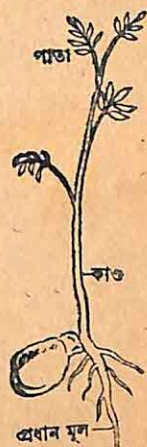
৫২নং চিত্র—ছোলারবীজ-অঙ্কুরণ।

সারাংশ—ছোলার বীজে বিভিন্ন অংশ—খোসা, ডিম্বক-রন্ধ্র, দুইটি মোটা বীজদল, ভাবীকাণ্ড ও ভাবীমূল থাকে। বীজ অঙ্কুরণের জন্য আলো, তাপ ও বায়ু দরকার।

প্রশ্ন

১। ছোলার বীজের কি কি আছে? ভাবীমূল ও ভাবীকাণ্ড কাহাকে বলে? ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দেখাও।

২ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর :—(১) অঙ্কুরণের জন্য জল, বাতাস ও তাপ দরকার। (২) শিকড় অন্ধকার চাহে, কাণ্ড আলো চাহে। (৩) অঙ্কুরণের জন্য বীজের খোসার দরকার।

হাতের কাজ—একটি ছোলার বীজ ভিজা করাতের গুঁড়ায় পোঁত এবং দিন দিন ইহার পরিবর্ত্তন খাতায় লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভুট্টার বীজ-অঙ্কুরণ

ভুট্টার বীজ—একটি দণ্ডের চারিধারে মুক্তার মত ভুট্টার বড় দানা সাজান থাকে। এই দানা বীজ নহে,—ফল। ফলের খোসার মধ্যে বীজ থাকে। ফলের খোসা (১) পুরু। বীজের খোসা পাতলা। ফলের খোসা ও বীজের খোসা এক হইয়া সোণালী রংয়ের ছাল (৫৩নং চিত্র) হইয়াছে।

আম-জামের শুধু বীজ পুঁতিলে গাছ হয়, কিন্তু ভুট্টার ফলের উপরকার পুরু খোসা ছাড়াইয়া বীজ পুঁতিলে চারা বাহির হয় না।

ভিজা দানা হইতে ফলের ও বীজের দুই খোসাই ছাড়াইয়া

ফেল। এখন একটি সাদা পদার্থ দেখিবে। ইহা ছোলার মত চেরা নয়। ইহাতে মাত্র একটি পাতলা **বীজপত্র** (৬) থাকে।

৫৩নং চিত্র—ভুট্টার দানা ও বীজ।

এখন একটি বীজকে লম্বালম্বি চিরিয়া পরীক্ষা কর। বীজের একদিকে মোটা ও চওড়া (২, খ), অপর দিক সরু (গ)। সরু অংশে **ভ্রূণ** আছে। মোটা অংশে শিশুউদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চিত থাকে। বীজপত্রের সাহায্যে শিশু-উদ্ভিদ্ মোটা অংশের সঞ্চিত খাদ্য শোষণ করিয়া আহার করে। ভ্রূণের মধ্যে **ভাবীমূল** (৫) ও **ভাবীকাণ্ড** (৩) লুকাইয়া থাকে। জল, তাপ, বাতাস পাইলে বীজ অঙ্কুরিত হয়।
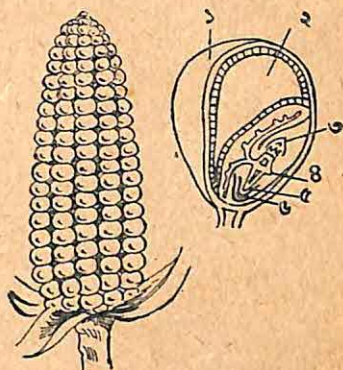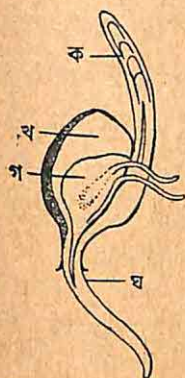
৫৪নং চিত্র—ভুট্টার বীজ-অঙ্কুরণ।

পরীক্ষা—কয়েকটি ভিজা বীজ মাটিতে কিংবা কাঠের গুঁড়ার মধ্যে পোঁত। প্রথমে **ভাবীমূল** (ঘ) মাটির নীচের দিকে যায়, পরে ভাবীকাণ্ড (ক) মাটির উপরে আসে। পরে এই মূল শুকাইযা য়ায় এবং উহার

পরিবর্ত্তে অনেকগুলি সরু সরু মূল বাহির হয়। দেখ, ভুট্টার বীজপত্র কখনও মাটির বাহিরে আসে না।

যে সব গাছের বীজে একটি বীজপত্র থাকে তাহাদিগকে **একবীজপত্রী** গাছ বলে, যথা :—ধান, যব প্রভৃতি। এক-বীজপত্রী গাছের অঙ্কুরণ ভুট্টা বীজের মত।

ভুট্টার ও ছোলার বীজের তুলনা

১। ভুট্টার দানা বীজ নহে—ফল।	১। ছোলা একটি বীজ।
২। ভুট্টার বীজে একটি বীজপত্র।	২। ছোলার বীজে দুইটি বীজপত্র।
৩। ভুট্টার বীজপত্রে খাদ্য থাকে না; উহা পাতলা।	৩। ছোলার বীজপত্রে খাদ্য থাকে; উহা মোটা।
৪। ভুট্টার ভাবীকাণ্ড হইতে গোছা শিকড় বাহির হয়।	৪। ছোলার গোছা শিকড় নাই; প্রধান ও শাখা শিকড় আছে।
৫। ভুট্টার বীজে খাদ্য বীজপত্রের বাহিরে থাকে। সেইজন্য ইহাকে বহিঃসার বীজ বলে।	৫। ছোলার বীজে খাদ্য বীজপত্রে থাকে বলিয়া ইহাকে অন্তঃসার বীজ বলে।

সারাংশ—ভুট্টার বীজে পাতলা খোসা, একটি পাতলা বীজদল, ভাবীমূল ও ভাবীকাণ্ড থাকে। ভুট্টার বীজপত্রে খাদ্য থাকে না। ইহাকে বহিঃসার বীজ বলে। ছোলার বীজপত্রে খাদ্য থাকে। ইহাকে অন্তঃসার বীজ বলে।

প্রশ্ন

১। ভুট্টার বীজের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর। ছোলার বীজের ও ভুট্টার বীজের তুলনা কর। ২। একবীজপত্রী গাছ ও দ্বিবীজপত্রী গাছ কাহাকে বলে, উদাহরণ দাও। এই দুই জাতীয় গাছের শিকড়ে পার্থক্য কি ? (M. E. 1939)

হাতের কাজ—ভুট্টার বীজ কাঠের গুঁড়ার মধ্যে পুঁতিলে উহার কি কি পরিবর্ত্তন হয় খাতায় লিখ।

সপ্তম অধ্যায়

মূলের গড়ন

মূলের বিভিন্ন অংশ—একটি ছোট আম চারার মূল পরীক্ষা কর। দেখ, ইহার একটি বড় মূল আছে। ইহাকে **প্রধান মূল** বলে। ইহা সোজাভাবে মাটির মধ্যে নামিয়া যায়। ইহার গা হইতে চারিদিকে অনেকগুলি **শাখামুল** বাহির হইয়াছে। শাখামূলের আগার দিকে অনেকগুলি শুঁয়া থাকে। ইহাদিগকে **মূলরোম** বলে। এই সকল মূলরোম দিয়া মাটি হইতে রস শুষিয়া লয়। প্রত্যেক মূলের আগা খুব কোমল। এই কোমল অংশ শক্ত মাটির ভিতর ঢুকিতে

ক
খ
গ

৫৫নং চিত্র—
ক—শাখামূল,
খ—মূলরোম,
গ—মূলত্রাণ

পারে না। সেইজন্য কোমল ডগার মুখে ছোট শক্ত ঢাক্‌নি থাকে। ইহাকে **মূলত্রাণ** বলে।

বিভিন্ন রকমের মূল—দেখ, আমের চারায় একটি **প্রধান মূল** সোজাভাবে মাটির মধ্যে নামিয়া গিয়াছে। প্রধান মূল হইতে বহু শাখা ও প্রশাখা বাহির হইয়াছে। আম, জাম, লিচু প্রত্যেক দ্বি-বীজপত্রী গাছের মূল এইরূপ।

দেখ, পেঁয়াজ চারার কাণ্ডের (৫৬নং চিত্রে ক) নীচে হইতে একগোছা সূতার মত সরু ও ছোট মূল বাহির হইয়াছে। ইহাদিগকে **গোছামূল** (খ) বলে। ইহাদের প্রধান মূল নাই। ধান, গম, যব, বাঁশ, ভুট্টা, নারিকেল প্রভৃতি এক-বীজ-পত্রী গাছের মূল এইরূপ।
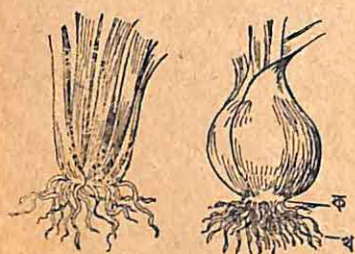
৫৬নং চিত্র—গোছামূল

মাটির ভিতরকার অঙ্কুর হইতে জন্মায় বলিয়া ইহাদিগকে **আসল** বা **প্রকৃত মূল** বলে। মাটির উপরের কাণ্ড, শাখা, পত্র প্রভৃতি অংশ হইতেও মূল বাহির হয়; ইহাদিগকে **অস্থানিক** বা **নকল** বা **অপ্রকৃত মূল** বলে। যথা :—

(১) বটের ও কেয়ার মোটা, শক্ত ঝুরি নকল মূল। বটের ঝুরি মাটি হইতে রস গ্রহণ করে।

(২) আম, ভুট্টা, বাঁশ প্রভৃতি গাছের কাণ্ডের **গ্রন্থি হইতে** অনেক মূল বাহির হয়।

৫৭নং চিত্র—বটের ঝুরি।

(৩) পাথরকুচি, হিমসাগর প্রভৃতি গাছের **পাতা হইতে** মূল বাহির হয়। (৫৮নং চিত্র ১, মূল)

(৪) গোলাপ, জবা প্রভৃতির ডাল কাটিয়া মাটিতে পুঁতিলে **ডাল হইতে** মূল বাহির হয়।
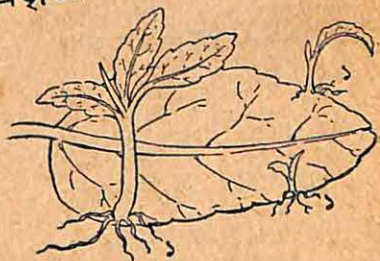
৫৮নং চিত্র—পাথরকুচির পাতা।

(৫) পান, গজপিপুল প্রভৃতি গাছ মূলের সাহায্যে অন্য গাছকে জড়াইয়া উঠে। এই মূলকে **আরোহিণী মূল** বলে।

(৬) **আলোক লতা** অস্থানিক মূল দ্বারা আশ্রয় বৃক্ষ

হইতে রস চুষিয়া নিজের দেহ পুষ্ট করে। এইরূপ মূলকে **শোষক** বা **পরভোজী মূল** বলে।

৫৯নং চিত্র—আলোক লতা।

(৭) এক প্রকার পরভোজী উদ্ভিদের মূল কতক বায়ুতে দোলে ও কতক আশ্রয়-বৃক্ষকে জড়াইয়া থাকে। প্রথম মূলকে **বায়বীয়** মূল বলে। ইহারা বায়ু হইতে অঙ্গারাম্ল গ্যাস ও জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে। **অর্কিড** বা **রাস্না** এই জাতীয় পরগাছা। ইহারা আম গাছ আশ্রয় করিয়া বড় হয়।

(৮) বেগুন ও তামাক গাছের মূলে এক রকম পরভোজী উদ্ভিদ্ (বেনেবউ) দেখা যায়। ইহারা ঐ সকল গাছের রস খায়।

৬০নং চিত্র—অর্কিড।

যে সকল উদ্ভিদ্ অন্য গাছের উপর জন্মায় এবং উহার সাহায্যে পরিপুষ্ট হয় তাহাকে **পরভোজী** উদ্ভিদ্ বলে। মূলগাছের ধ্বংসের সঙ্গে ইহারাও ধ্বংস হয়। ইহারা মূলগাছের উপর শিকড় বিস্তার

করে। এই শিকড় হইতে নূতন পরগাছা জন্মায়। ইহারা এইরূপে বংবশবৃদ্ধি করে।

৬১নং চিত্র—জলজ উদ্ভিদের মূল।

৬২নং চিত্র—ছিদ্রযুক্ত মূল

(৯) পানা, পানিফল প্রভৃতি **জলজ উদ্ভিদের** মূল খুব সরু, বহু শাখাযুক্ত হয়। ইহারা জলে ভাসিতে থাকে।
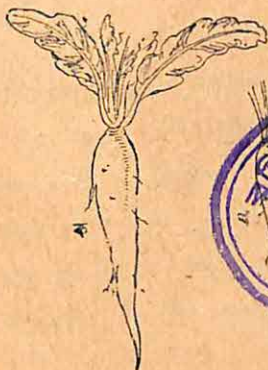
৬৩নং চিত্র মুলা, গাজর, শালগম।

(১) সমুদ্রের নিকট সুন্দরী, গরাণ প্রভৃতি গাছের

শিকড়ের অগ্রভাগ মাটি হইতে মাথা তুলিয়া বায়ুর মধ্যে থাকে। বায়ু গ্রহণ করিবার জন্য শিকড়ের আগায় ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। (৬২নং চিত্র)।

কোন কোন উদ্ভিদের মূলে ভবিষ্যতের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চিত থকে; সেইজন্য ইহারা মোটা, শাঁসাল ও বিভিন্ন আকারের হয়। **মূলা, গাজর, শালগম** এই জাতীয় মূল। ইহাদিগকে **খাদ্যভাণ্ডার** মূল বলে এবং ইহারা মাটির নীচে থাকে বলিয়া ইহারা **আসল মূল**।

মূলের কাজ—(১)—গাছ কেবল তরল **পদার্থ** খাইতে পারে। গাছ মূল হইতে একপ্রকার অম্লরস বাহির করিয়া মাটির কঠিন পদার্থ তরল করে এবং মূলরোম দিয়া মাটি হইতে তরল রস শোষণ করে। (২) মূল গাছকে মাটির সহিত আবদ্ধ রাখে।

সারাংশ—মূলের প্রধান মূল, শাখা মূল, মূলত্রাণ, মূলরোম, বিভিন্ন অংশ থাকে। মাটীর ভিতরকার মূলকে প্রকৃত মূল বলে। মাটির উপরের মূলকে অপ্রকৃত মূল বলে। অপ্রকৃত মূল কাণ্ড, পাতা, ডাল হইতে বাহির হয়। আরোহিণী মূল অন্য গাছকে জড়াইয়া উঠে। পরভোজী গাছের মূল অন্য গাছকে আশ্রয় করিয়া বড় হয়। কতক গুলি পরভোজী উদ্ভিদের মূল বাতাসে দোলে। ইহাকে বায়বীয় মূল বলে।

প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ বিভিন্ন মূলের বর্ণনা কর (M. E. 1940)।

২। নিম্নলিখিত গাছের কি রকম মূল—ধান, যব, আম, জাম, আলোক-লতা, রাস্না, পানিফল, গজপিপুল ?

৩। প্রকৃত ও অপ্রকৃত মূল কাহাকে বলে ? (M. E. 1937)

৪। শোষক মূল, গোছামূল, আরোহিণী মূল ও বায়বীয় মূল কাহাকে বলে ? দৃষ্টান্ত দাও।

৫। পরভোজী উদ্ভিদ্ কি ? একটি উদাহরণ দাও। পরভোজীর জীবনধারণের প্রণালী বর্ণনা কর। (M. E. 1939)

হাতের কাজ :—(১) আখ, বাঁশ, পাথরকুচি, গজপিপুল, ঘাস, পানা, চই প্রভৃতি গাছের শিকড় ও বটের ঝুরি সংগ্রহ কর। কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর শিকড় দেখাও।

(২) ভিজা করাতের গুঁড়ার মধ্যে একটি ছোলাবীজ পোঁত। সাত দিন পরে শিকড়ের ছবি আঁক।

অষ্টম অধ্যায়

কাণ্ডের কথা

কাণ্ডের অংশ—কাণ্ডের মাথায় একটি মুকুল এবং কাণ্ডের গায়ে প্রত্যেক পাতার জোড়-মুখে একটি মুকুল থাকে। মাথার মুকুলের বৃদ্ধিতে কাণ্ড লম্বা হয় এবং গায়ের মুকুলের বৃদ্ধিতে কাণ্ডে ডাল-পালা হয়। কাণ্ডের যে স্থান হইতে পাতা বাহির হয় তাহাকে **গাঁইট** বলে। দুই গাঁইটের মধ্যের স্থানকে **পাব** বলে।

কাণ্ডের প্রকৃতি—কাণ্ড নানা রকম। আম, জাম, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বহু ডালপালাযুক্ত দ্বি-বীজপত্রী গাছের কাণ্ড **খুব শক্ত নিরেট ও মোটা**; বাঁশ, গম, ধান প্রভৃতি অল্প ডাল-পালাযুক্ত একবীজপত্রী গাছের কাণ্ড **সরু ও ফাঁপা** হয়। তাল, নারিকেল গাছের গায়ের মুকুল বাড়ে না বলিয়া ইহাদের কাণ্ড **খুব লম্বা ও কম মোটা** হয়। শিম, লাউ, কুমড়া, ঝুমকোলতা, ঝিঙে প্রভৃতি গাছের কাণ্ড **খুব সরু ও লম্বা** (১-৫)। ইহারা সোজা দাঁড়াইতে পারে না।

৪৬নং চিত্র—কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ

কুমড়া, শসা, ঝিঙ্গে, মটর উচ্ছে গাছ সূতার ন্যায় **আকর্ষীর**
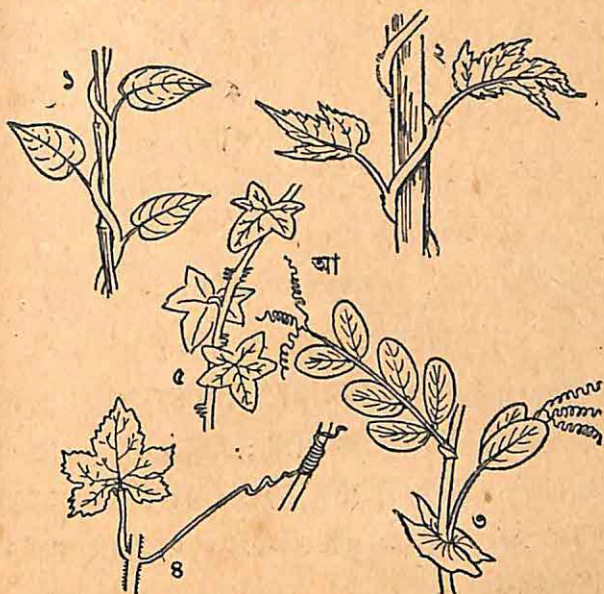
৬৫নং চিত্র—নানা রকমের **কাণ্ড**।

সাহায্যে (৩, ৪ আ) অন্য বস্তু বা বড় গাছকে আশ্রয় করিয়া লতাইয়া চলে। শিম, অপরাজিতা, পুঁই, গাছের সরু কাণ্ড স্ক্রুপের প্যাঁচের মত বাম দিকে বা ডান দিকে অন্য বস্তুকে জড়াইয়া চলে (১, ২)। ইহাদের আকর্ষী থাকে না। পান, গজ-পিপুল **শিকড়ের সাহায্যে** অন্য গাছকে জড়াইয়া উঠে।

৬৬ নং চিত্র—ত্রিশিরা মনসা

কাণ্ডের পরিণতি—কাঁটা, আকর্ষী প্রভৃতি বিকৃত কাণ্ড। বেল, বেগুন, গোলাপের গাছে কাঁটা থাকে। ইহারা কাঁটার সাহায্যে আত্মরক্ষা করে। বেত, শিয়াকুল, চুপড়িআলুর গাছ **কাঁটার সাহায্যে** আটকাইয়া আশ্রয় গাছের উপর উঠিয়া যায়। শিম, কুমড়ার আকর্ষী আছে।

৬৭নং চিত্র—ফনী-মনসা,ক—কাঁটা।

কাণ্ডের আকৃতি—বাঁশ, আম, জাম, কাঁটালের কাণ্ড গোলাকার। তুলসী, পুদিনা গাছের কাণ্ড **চারশিরা** ; মনসা ও মুথাঘাসের কাণ্ড **তে-শিরা** ; ফণীমনসার কাণ্ড পাতার **মত চ্যাপ্টা**, সবুজ ও কাঁটাযুক্ত। হাড়জোড়া গাছের কাণ্ডে অনেক গাঁট পরস্পর মালার মত গাঁথা থাকে।

শাখাযুক্ত ও শাখাহীন গাছ—আম, জাম, বট, তেঁতুল প্রভৃতি দ্বিদল গাছের প্রায়ই শাখা আছে। নারিকেল, তাল, সুপারি প্রভৃতি একদল গাছের শাখা থাকে না। এই গাছের মুকুল ডালে পরিণত হয় না।

মাটির নীচের বা অস্থানিক কাণ্ড—আলু, আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি গাছের কাণ্ডের বেশীর ভাগ মাটির নীচে থাকে। ইহাদের গায়ে ও মাথায় **মুকুল** থাকে, গায়ে পাতলা **পাতা** থাকে এবং **পাব** দেখা যায়। সুতরাং ইহারা মূল নহে

ইহারা মাটির নীচের কাণ্ড। আলুর 'চোখ', ওল ও কচুর 'মুখী' ইহাদের কুঁড়ি। ইহাদের পুঁতিলে নূতন গাছ জন্মায়। ইহাদের কাণ্ডের মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। মানকচু ও ওলের কাণ্ড নীচের দিকে বাড়ে। হলুদ ও আদার কাণ্ড পাশাপাশি বাড়ে।

৬৮নং চিত্র—আদা গাছ।

কাণ্ডের কার্য্য—(১) মূল মাটি হইতে যে রস সংগ্রহ করে তাহা কাণ্ডের মধ্য দিয়া পাতায় পৌঁছায়। (২) কাণ্ড ডালপালা ও পত্র ধারণ করে এবং পত্রগুলিকে যথাসম্ভব সূর্য্যের আলোর দিকে ঘুরাইয়া রাখে। (৩) কাণ্ডের সবুজ অংশ সূর্য্যালোক হইতে অঙ্গার আত্মকরণ করে। (৪) আম, জবা, লিচু প্রভৃতি গাছের ডাল পুঁতিলে নূতন গাছ জন্মায়, এতএব কাণ্ড বংশ রক্ষা করে। (৫) আলু, কচু, ওল প্রভৃতির কাণ্ডে প্রচুর খাদ্য থাকে।

সারাংশ—(১) কোন গাছের কাণ্ড মোটা ও নিরেট, কোন গাছের কাণ্ড সরু ও ফাঁপা হয়। লতানে গাছের কাণ্ড সরু হয়। ইহারা কাঁটা ও আকর্ষীর সাহায্যে কিংবা অন্য গাছকে জড়াইয়া চলে। (২) কাণ্ড গোলাকার, চারশিরা, তেশিরা নানা আকারের হয়। (৩) মাটির নীচেও অনেক গাছের কাণ্ড থাকে, যথা:—আলু, আদা, ওল, মানকচু। (৪) পত্র ও ডালপালা ধারণ করা, খাদ্য প্রস্তুত করা, বংশ বৃদ্ধি করা ও খাদ্য সঞ্চয় করা কাণ্ডের কার্য্য।

মূল ও কাণ্ডের তুলনা

কাণ্ড	মূল
(১) ভ্রূণকাণ্ড প্রধান কাণ্ডে পরিণত হয়।	(১) কতক গাছে ভ্রূণমূল প্রধান মূল হয় এবং কতক গাছে শুকাইয়া যায়। যথা:— ধান, ভূট্টা।
(২) কাণ্ডে পাতা, ফুল ও ফল জন্মায়।	(২) মূলে ইহারা হয় না; উভয়েরই শাখা-প্রশাখা হয়।
(৩) কাণ্ডের মাথায় মুকুল থাকে।	(৩) মূলের মাথায় মূলত্রাণ থাকে।
(৪) কাণ্ড প্রায়ই মাটির উপরে হয়।	(৪) মূল প্রায়ই মাটির নীচে হয়।

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন কাণ্ডের গঠন বর্ণনা কর।

২। নিম্নলিখিত গাছের কি রকম কাণ্ড? আম, শিম, নারিকেল, মটর, পান, ধান।

৩। মাটির নীচের কাণ্ডের উদাহরণ দাও।

হাতের কাজ—(১) বীজকে উল্টা করিয়া পোঁত। দেখ কাণ্ড কোন্ দিকে বাড়ে। (২) আম, কুমড়া, নারিকেল গাছের কাণ্ড কি রকম হয় খাতায় আঁক।

নবম অধ্যায়

পাতার গঠন

পাতার বিভিন্ন অংশ ঃ—একটি আমের পাতা পরীক্ষা কর। পাতার রং সবুজ। ইহার চওড়া পাতলা অংশকে **ফলক** বলে। ফলকের নীচের **সরু** অংশকে **বৃন্ত** বা **বোঁটা** বলে। বোঁটার নীচে যে চওড়া অংশ কাণ্ডের গায়ে জড়াইয়া থাকে তাহাকে **বেষ্টনী** বলে। জাম; আম, কচু, তাল প্রভৃতির পাতায় বৃন্ত থাকে। ইহাদিগকে **সবৃন্তক** বলে। আখ, ভুট্টা পাতায় বৃন্ত নাই। ইহাদিগকে অবৃন্তক বলে। আকন্দ, গন্ধরাজের পাতায় কেবল ফলক আছে; বৃন্ত ও বেষ্টনী নাই। কোন কোন পাতার বোঁটার দুই পাশে দুইটি ছোট পত্র থাকে। উহাদিগকে উপপত্র বলে।
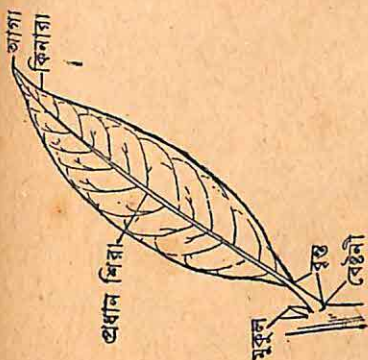
৬৯নং চিত্র—পাতার বিভিন্ন অংশ।

ফলকের সংখ্যা ও সজ্জা—আম, জাম, চালতা, কাঁটাল, জবা, কুমড়া, শসা, পেয়ারা প্রভৃতির পাতায় একটি মাত্র ফলক

আছে। এই পত্রগুলি বোঁটা দ্বারা সংলগ্ন থাকে। ইহাদিগকে **একফলক** বলে।
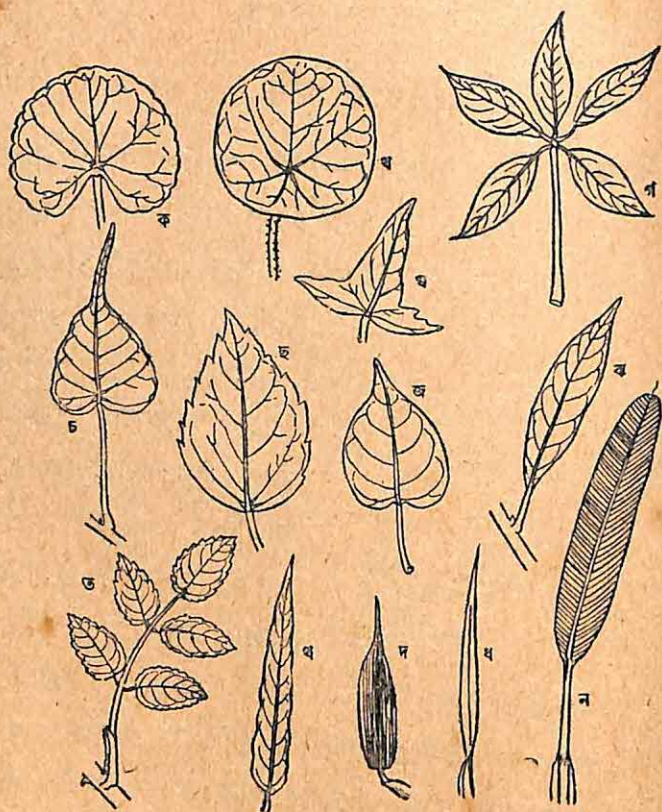
৭০নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকারের পাতা ; ক থুলকুড়ি, খ—পদ্ম, গ—শিমূল, ঘ—কচু, চ—অশ্বত্থ, ছ—জবা, জ—পান, ঝ—আম, ত—গোলাপ, থ—দেবদারু, দ—বাঁশ, ধ—ঘাস, ন—কলা।

বেলের পাতা তিনটি, শুশ্‌নির চারিটি, শিমূলের পাঁচটি এবং তেঁতুল, শিরিষ, কুঁচ, বাবলা, সজিনা, নিম, আমরুল ও লজ্জাবতীর পাতা বহু অংশে বিভক্ত হয়। ইহাদিগকে **বহুফলক** পত্র বলে। ফলকের ছোট অংশকে **পত্রক** বলে।

তেঁতুল, কৃষ্ণচূড়া, সজিনার পাতায় পত্রকগুলি বামে ও ডাইনে পালকের মত বাহির হইয়াছে। ইহাদিগকে **পক্ষাকার পত্র** বলে। আমরুল, শিম, শিমূল পাতার বোঁটার এক জায়গা হইতে সকল পত্রক বাহির হইয়াছে। ইহাদিগকে **করতলাকার** পত্র বলে।

পাতার আকৃতি—নানা প্রকারের পাতা পরীক্ষা কর। দেখ, ফলকের আকার বিভিন্ন। ধান, ভুট্টা প্রভৃতির পাতা লম্বায় বড়, চওড়ায় খুব ছোট। ইহারা **বর্শার মত**। কলা, পেয়ারার পাতা চওড়ায় যতটা, লম্বায় তাহার তিন গুণ বেশী। থুলকুড়ী পাতা **বৃক্কাকৃতি**। পান, গুলঞ্চর পাতা **হরতনের টেক্কার** মত। কুল ও পদ্মগাছের পাতা গোলাকার। কচুর পাতা **তীরের** মত। ঘাসের পাতা **সরল রেখার** মত।

পাতার শিরা-বিন্যাস—একটি আম পাতা রৌদ্রে ধর। দেখ, আম পাতার ঠিক মাঝখানে বোঁটা হইতে আগা পর্য্যন্ত একটা মোটা শিরা চলিয়া গিয়াছে। ইহাকে **মধ্যশিরা** বলে। এই মধ্যশিরা হইতে উভয় পার্শ্বে পাতার কিনারা পর্য্যন্ত নানা শাখাশিরা ও উপশিরা বিস্তৃত হইয়া

একটা জাল সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে **জালশিরা** বলে। দ্বিদল-বীজ গাছের পাতায় এইরূপ জালশিরা থাকে। একদল-বীজ
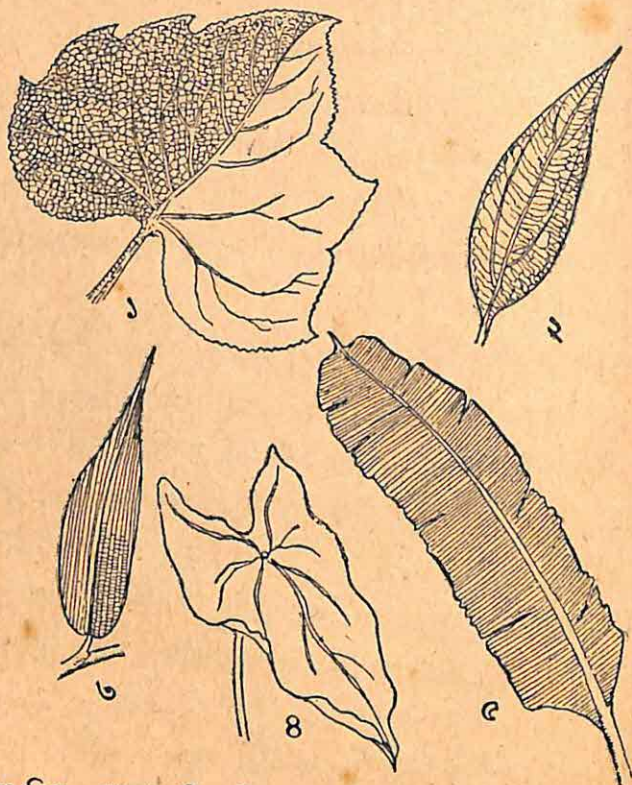
৭১ নং চিত্র—পাতার শিরা-বিন্যাস। ১—বট পাতা, ২—আম পাতা, ইহারা জালশিরা ; ৩—ধান পাতা, ৪—কচু পাতা, ৫—কলার পাতা।

গাছের পাতায় শিরাগুলি হয় বোঁটা হইতে আগা পর্য্যন্ত সমান্তরাল থাকে তেমন বাঁশপাতার শিরা কিংবা মধ্যশিরা

হইতে কিনারা পর্য্যন্ত সমান্তরাল থাকে যেমন কলার পাতার শিরা। ইহাদিগকে **সমান্তরাল শিরা** বলে।

পাতার কিনারা ও চূড়া—কতকগুলি পাতার কিনারা ও চূড়া পরীক্ষা কর। আম, জাম, বট, কাঁটাল পাতার কিনারা **একটানা**; গোলাপের পাতার কিনারা করাতের **খাঁজের** মত (ক); জবার পাতার কিনারার খাঁজগুলি বড় ও পাশের দিকে মুখ করিয়া থাকে (খ); বেল ও লেবুর পাতার খাঁজগুলি **গোল** (গ); দেবদারু ও বকুল গাছের পাতার কিনারা **ঢেউ খেলান** (ঘ); শিয়ালকাঁটার পাতার খাঁজগুলি **খুব সরু** (চ)।
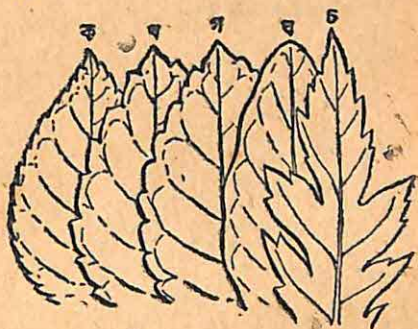
৭২নং চিত্র—পাতার কিনারা

পেঁপে পাতার কিনারা গভীরভাবে **খাঁজ কাটা**। কোন পাতার আগা বা চূড়া **ভোঁতা** (কাঁটাল)। কোন পাতার চূড়া **সরু ও লম্বা** (আম)। অশ্বত্থ, পান পাতার চূড়া খুব **লম্বা ও শীষযুক্ত**; আনারস পাতার চূড়া **সূঁচের মত**। কাঞ্চনের পাতার চূড়া **খাঁজকাটা**।

পাতার বর্ণ—অধিকাংশ গাছের পাতার বর্ণ সবুজ। ক্রোটনের পাতা নানা বর্ণের হয়। কচি পাতার বর্ণ হরিদ্রা কিংবা সবুজ হয়। অশ্বত্থের ও গোলাপের কচি পাতায় লাল্চে

আভা থাকে। সূর্য্যের আলোকে গাছের তলায় **ক্লোরোফিল** নামক সবুজ পদার্থের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য গাছের পাতার বর্ণ সবুজ হয়।

শীতের পূর্ব্বে ডাল হইতে পাতায় রস সঞ্চারিত হয় না বলিয়া এই সময়ে অনেক গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে।

পাতার কার্য্য :—(১) শ্বাসকার্য্য—পাতার নীচের পিঠে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। ইহাদিগকে **ষ্টোমা** বলে। এই ছিদ্র দিয়া গাছ সর্ব্বদাই বাতাস হইতে অক্সিজেন লয় ও কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া দেয়।

৭৩নং চিত্র—পাতার ষ্টোমা।
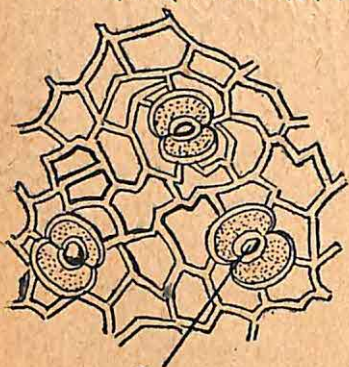
(২) **আহার প্রস্তত**—পাতায় অসংখ্য সবুজ কণা থাকে। মাটির রস মূল ও কাণ্ড দিয়া পাতায় হাজির হয়। সবুজ কণা সূর্য্যের আলোর সাহায্যে বাতাসের কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে আহার লয় এবং মাটির রসের সহিত মিশাইয়া নানাপ্রকার জটিল খাদ্য প্রস্তুত করে। এই কার্য্য কেবল দিনে চলে।

(৩) **প্রস্বেদন বা ঘাম বাহির করা**—পাতার ছিদ্র দিয়া গাছের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়।

(৪) পাতার জন্য গাছের গোড়ায় মাটি শুকাইয়া যায় না, মাটি সব সময়ই সরস থাকে।

(৫) শিরার দ্বারা পাতা দৃঢ় ও মজবুত থাকে। পাতার শিরা দিয়া মাটির রস পাতায় পৌঁছায় এবং পাতায় প্রস্তুত তরল খাদ্য শিরা দিয়া দেহের অন্যত্র যায়।

সারাংশ—(১) পাতার **ফলক, বোঁটা** ও **বেষ্টনী** তিনটি অংশ আছে। পাতা এক ফলক ও বহু ফলক যুক্ত হয়। (২) পাতার শিরা জালের মত হয় বা সমান্তরাল হয়। (৩) পাতার আকার গোলাকার হরতনের টেক্কার মত, সরল তীরের মত কিংবা বর্শার মত হয়। (৪) পাতা দিয়া গাছ নিঃশ্বাস লয়, জল বাহির করে এবং সূর্য্যের আলোর সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করে।

প্রশ্ন

১। পাতার বিভিন্ন অংশের নাম বল।

২। গাছের পত্রসজ্জার উদাহরণ দাও।

৩। বিভিন্ন পাতার আকৃতি বর্ণনা কর।

৪। পাতার আগা ও কিনারা কিরূপ হয় আঁক।

৫। বিভিন্ন প্রকারের পত্রের বর্ণনা কর। (M. E. 1940)

দ্রষ্টব্য—ফলক, আকৃতি, আগার পার্থক্য দেখাইবে।

৬। পাতার বর্ণ সবুজ কেন? (M. E. 1939)

দশম অধ্যায়

ফুলের গড়ন

ফুল—তোমরা নানাবর্ণের ফুল ভালবাস। ফুলের সৌন্দর্য্যে কে না মুগ্ধ হয়! ফুল শুধু গাছের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে না, ফুল হইতে ফল হয়, ফলের মধ্যে বীজ থাকে, বীজ হইতে গাছের বংশ রক্ষা হয়। গাছ পুষ্ট হইলে তবে ফুল ধারণ করে।

ফুলের গড়ন—প্রত্যেক ফুলের চারিটি অংশ থাকে—**বৃতি, দল, পুংকেশর, গর্ভকেশর**। ইহাদের অবস্থান অনুসারে ফুলের গড়ন বিভিন্ন হয়।

বৃতির প্রকৃতি—ফুলের বাহিরে সবুজ অংশকে বৃতি (ক) বলে। ধুতুরা ফুলের বৃতির মুখে পাঁচটি দাঁতের মত দেখিবে। ইহাদিগকে **বৃত্যংশ** বলে। ধুতুরা, লেবু, আতা ও জবা ফুলের বৃত্যংশগুলি মিলিত থাকে। মূলা, শালুক ও পদ্মফুলের বৃত্যংশগুলি পৃথক্ হয়। অনেক ফুলে নলের মত বৃতি দেখা যায়। অধিকাংশ বৃতি সবুজ। কোনটা সাদা বা কোনটা লালও হয়। কোন কোন ফুলে বৃতির বাহিরে সবুজ **উপবৃতি** দেখিবে, যথা—জবা, স্থলপদ্ম।

দলের প্রকৃতি—ফুলের পাঁপড়িগুলি নানাভাবে সাজান থাকে। পাঁপড়িগুলি পেয়ারার ফুলে এক স্তরে এবং পদ্মফুলে বহু স্তরে সাজান থাকে। পাঁপড়ির সংখ্যাও বিভিন্ন ফুলে

বিভিন্ন হয়। পদ্মের পাঁপড়ি অনেক বলিয়া পদ্মকে শতদল বলে। অপরাজিতা, পপি, আমরুল, রক্তকাঞ্চন, শালুক, পদ্ম (৭৭নং চিত্র) ও গোলাপ ফুলের পাঁপড়িগুলি পৃথক্ পৃথক্;
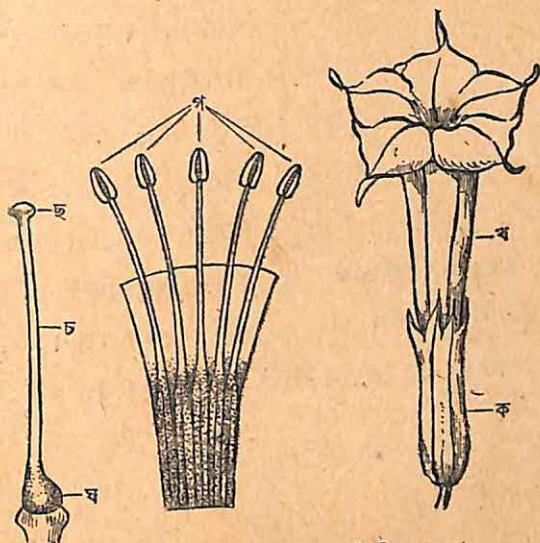
৭৪নং চিত্র—ধুতুরা ফুলের বিভিন্ন অংশ

রজনীগন্ধা, ধুতুরা (৭৪নং চিত্রে খ), যুঁই, বেগুন, লঙ্কা, তিল, তুলসী ৭৭নং চিত্র) প্রভৃতি ফুলের পাঁপড়িগুলির তলাকার অংশ জোড়া; ইহারা দেখিতে নলের মত। রাঙা-আলু, তরুলতার পাঁপড়িগুলি আগাগোড়া জোড়া। কস্তুরী ফুলের পাঁপড়ি নীচের দিকে সংযুক্ত হইয়া একটি নলের সৃষ্টি করে এবং এই ফুলের পাঁপড়িগুলি উপরদিকে পৃথক পৃথক ও নীচের দিকে বেশীর ভাগ জোড়া থাকে (৭৭নং চিত্র)। পাথর-

কুচির পাঁচটি পাঁপড়ি পরস্পর সংলগ্ন কেবল মুখের দিকে একটু বিচ্ছিন্ন। পাঁপড়িগুলি ডাগর দিকে সূঁচাল। শিউলী, শিয়ালকাঁটা ফুলের (খ) সকল পাঁপড়িগুলি এক আকৃতির এবং তিল, দোপাটী ও বক ফুলের পাঁপড়িগুলি ভিন্ন আকৃতির। দ্রোণ ও তুলসী ফুলের পাঁপড়ির আকৃতি হাঁ-করা মুখের মত। সূর্য্যমুখীর প্রত্যেক ছোট ফুলের জোড়া পাঁপড়িগুলি কলকের মত দেখিতে।
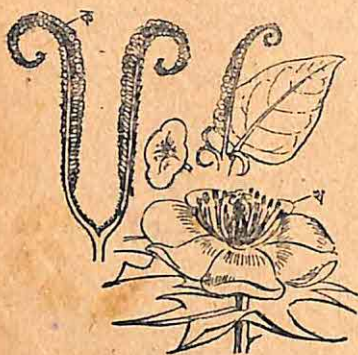
৭৫নং চিত্র—হাতিশুঁড় ও শিয়ালকাঁটার ফুল।
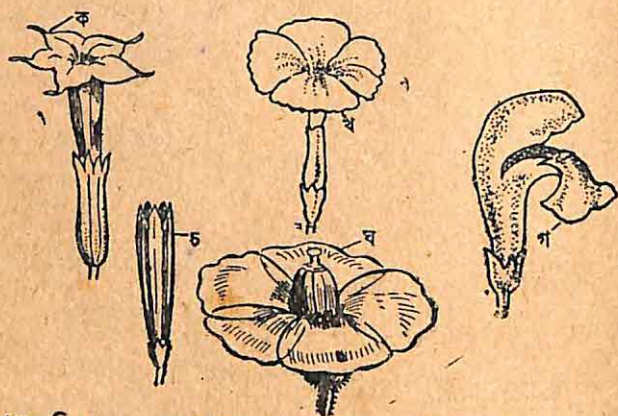
৭৬নং চিত্র—ফুলের বিভিন্ন গড়ন। ক—ধুতুরা। খ—সাবুনি। গ—দ্রোণ। ঘ—আকন্দ।

পুংকেশরের আকৃতি—পাঁপড়ির পরের স্তরকে পুং
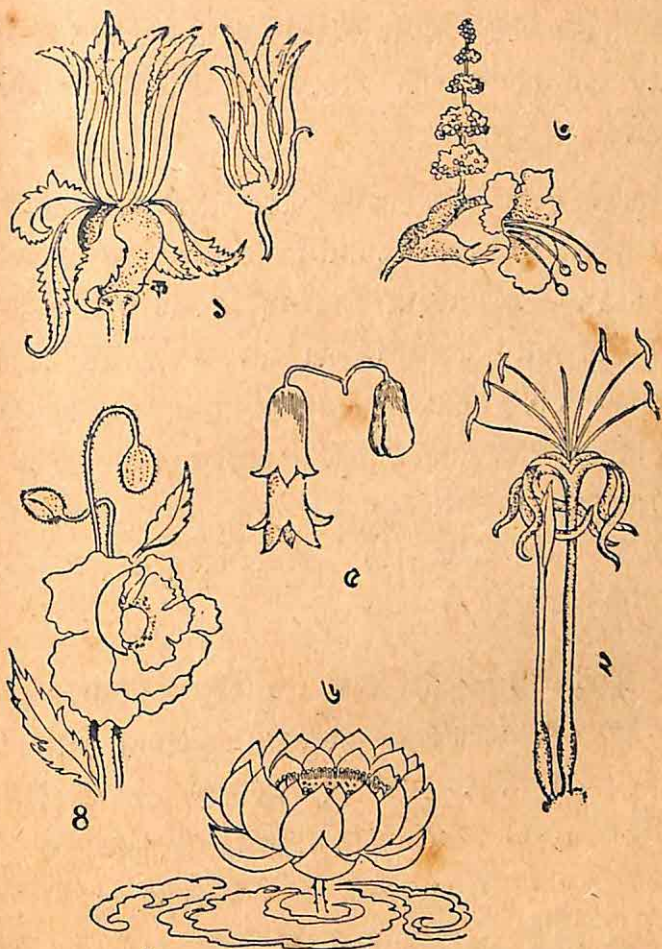
৭৭নং চিত্র—১—মিষ্টি কুমড়ার স্ত্রী (বামদিকে) ও পুং (ডানদিকে) ফুল। ক—মিষ্টি কুমড়ার জালি। ২—কস্তুরী ফুল। ৩—তুলসী ফুল। ৪—পপির কলি ও ফুল। ৫—পাথরকুচির ফুল ও কলি। ৬—পদ্মফুল।

কেশর চক্র বলে। ইহার প্রত্যেক অংশকে পুংকেশর বলে। পুংকেশরের মাথায় মোটা অংশকে **রেণুস্থলী** ও নীচের সরু অংশকে **দণ্ড** বলে।

ধুতুরা ফুলের দলের ভিতর গায়ে পাঁচটি লম্বা পুংকেশর (৭৪নং চিত্রে গ) আছে। গোলাপ ফুলের অসংখ্য পুংকেশর। সরিষা ফুলে ছয়টি পুংকেশরের মধ্যে দুইটি ছোট ও চারিটি বড়। জবা ফুলে পুংকেশরগুলি মিলিয়া লাল নলের মত দেখায়। নলের উপর দিক্ হইতে অনেক রেণুস্থলী বাহির হয়। তুলসী ফুলের পুংকেশরের সংখ্যা চারিটি। দুইটি লম্বা ও দুইটি ছোট। পপির ফুলে পুংকেশরের সংখ্যা বহু। ইহারা গর্ভকেশরের চারিদিকে সারি বাঁধিয়া থাকে। গর্ভকেশরের লম্বা দণ্ড নাই। (৭৭নং চিত্র ৪)

গর্ভকেশর—ফুলের চতুর্থ স্তর হইল **গর্ভকেশর চক্র**; প্রত্যেক গর্ভকেশরের তিনটি অংশ, যথা :—মাথায় গোল **মুণ্ড** (৭৪নং চিত্রে ছ), মধ্যে সরু লম্বা **গর্ভদণ্ড** (চ), নীচে মোটা **গর্ভকোষ** (ঘ)। গোলাপ ফুলে গর্ভকেশরগুলি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে থাকে। জবা ফুলে গর্ভকেশরে একটি গর্ভকোষ, একটি গর্ভদণ্ড কিন্তু পাঁচটি মুণ্ড। ধুতুরা ফুলে দুইটি গর্ভকেশর মিলিত একটি গর্ভকোষ ও একটি গর্ভদণ্ড হয়।

পুষ্পাধার—ফুলের চারিটি স্তর একটি বড় আধারের উপর থাকে। ইহাকে **পুষ্পাধার** বলে। গোলাপের পুষ্পাধার বাটির

মত, চাঁপা ফুলের পুষ্পাধার লম্বা, পদ্ম ফুলের পুষ্পাধারের উপরটা চ্যাপ্টা ও নীচের দিক্ সরু।

সব ফুলেরই চারিটী অংশ থাকে না ; যে ফুলের সব অংশ থাকে তাহাকে **সম্পূর্ণ** ফুল বলে, যেমন ধুতুরার ফুল। যে কোন একটি অংশের অভাব ঘটিলে তাহাকে **অসম্পূর্ণ** ফুল বলে, যেমন শশা, পেঁপে ও কুমড়ার ফুল। কুমড়ার প্রত্যেক ফুলে হয় পুংকেশর না হয় গর্ভকেশর থাকে, ইহাদিগকে **একলিঙ্গ ফুল** বলে। কিন্তু একই গাছে পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প থাকে। পেঁপের এক গাছে কেবল স্ত্রীপুষ্প, অন্য গাছে কেবল পুংপুষ্প থাকে।

একাধিক ফুল এক সঙ্গে থাকিলে তাহাকে **পুষ্পমঞ্জরী** বলে। গাঁদাফুল এইরূপ একটি পুষ্পমঞ্জরী।

সারাংশ—ফুলের চারিটি অংশ, যথা—বৃতি, দল, পুংকেশর, গর্ভকেশর। পুংকেশরের দুইটি অংশ, যথা—দণ্ড ও রেণুস্থলী। গর্ভকেশরের তিনটি অংশ যথা—মুণ্ড, গর্ভদণ্ড, গর্ভকোষ। এই চারিটি অংশ পুষ্পাধারে সজ্জিত থাকে। এই সকল অংশ সব ফুলে এক নয়।

প্রশ্ন

১। ফুলের কয়েকটি অংশ আছে, ধুতুরা ফুল দিয়া বুঝাইয়া দাও।
২। জোড়া পাপড়ির, ভিন্ন আকৃতির পাপড়ির উদাহরণ দাও।

হাতের কাজ—ধুতুরা ফুলের বিভিন্ন অংশ আঁক। আকন্দ, শিউলি, তুলসী ফুল আঁক।

একাদশ অধ্যায়

ফলের গড়ন

মটর, অড়হর, কার্পাস, শিম, দোপাটি প্রভৃতি ফল থাকিলে ফলের খোসা ফাটিয়া যার এবং বীজগুলি ছড়াইয়া মাটিতে পড়ে। ইহাদিগকে **স্ফোটক ফল** বলে। আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি ফল পাকিলে খোসা ফাটে না। ইহাদিগকে **অস্ফোটক ফল** বলে।

স্ফোটক ফল—মটর, শিম, বাব্‌লা প্রভৃতি ফলে দুই পাশই ফাটিয়া যায়। কিন্তু আকন্দ, করবী ফলের কেবল একটা পাশ ফাটিয়া যায়। দোপাটি, রেড়ী, ভেরেণ্ডা প্রভৃতি ফলের জোড়ের মুখ স্থানে স্থানে ফাটিয়া যায়।

অস্ফোটক ফল—লেবু, পেঁপে, আঙ্গুর, তরমুজ ও উচ্ছে ফলের খোসা প্রায়ই মোটা হয়। ইহাদিগের ভিতরে নরম ও সরস শাঁস এবং শাঁসের ভিতর বীজ থাকে। ইহাদিগকে **বার্ত্তাকু** ফল বলে।

আম, বাদাম, কুল প্রভৃতি ফলে বার্ত্তাকু ফলের মত সরস ও নরম শাঁস থাকে, কিন্তু বীজের পরিবর্ত্তে আঁটি থাকে। ইহাদিগকে **সাষ্ঠিক** বলে।

ধান, গম, যব, গাঁদা, সূর্য্যমুখী প্রভৃতির ফলে শাঁস থাকে না, থাকে কেবল শুষ্ক খোসা।

ফলের আকৃতি—মটর শুঁটি, বরবটি, শিম প্রভৃতি গাছের
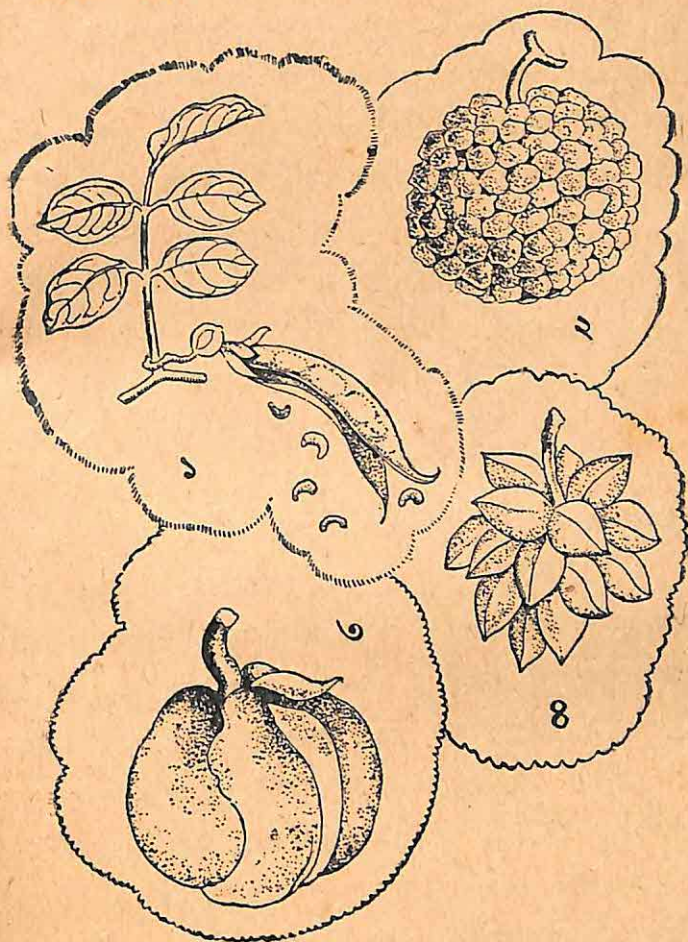
৭৮নং চিত্র—১—অপরাজিতার ফল ফাটিয়া বীজ ছড়াইয়াছে।
২—আতা। ৩—চাল্‌তা। ৪—কাঁটালি চাঁপা।

প্রত্যেক ফল ফুলের একটি গর্ভকোষ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের ভিতর একসারি বীজ থাকে। লাউ, শশা, কুমড়া, বেগুন, কলা প্রভৃতি গাছের বহু বীজ যুক্ত প্রত্যেক ফল একটি ফুলের যুক্ত গর্ভকোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই উভয় প্রকার ফলের (একটি ফুল হইতে একটি ফল) **মৌলিক** (Simple) ফল বলে। করবী, আতা, চাঁপা, দেবদারুর ফল একটি ফুলের পৃথক্ পৃথক্ গর্ভকোষ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে (একটি ফুল হইতে বহু ফল) **গুচ্ছ** (Aggregate) ফল বলে।

৭৯নং চিত্র—কাটা পেঁপে ও নারিকেল।

আনারস, কাঁটাল, তুঁতে কদম, ডুমুর প্রভৃতি একটি গোটা ফল নয়। ইহারা প্রত্যেকে অনেক ফলের সমষ্টি। ইহাদের মঞ্জরীতে অনেক ফুল হইতে ফল উৎপন্ন হয় এবং ফলগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকে বলিয়া ইহাদিগকে একটি গোটা ফলের মত দেখায়। ইহাদিগকে **যৌগিক** (Multiple) **ফল** বলে। কাঁটালের গায়ে যতগুলি কাঁটা, আনারসের গায়ে যতগুলি চোখ, ইহাদের ভিতরে ততগুলি ফল। কাঁটালের ভিতরের লম্বা কঠিন অংশ ফুলের মঞ্জরীর দণ্ড হইতে এবং কাঁটালের কোয়া-

গুলি ফুলের গর্ভকোষ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক কোয়ার ভিতর একটি বীজ থাকে। কচি ডুমুরের ভিতরে গর্ত্তের
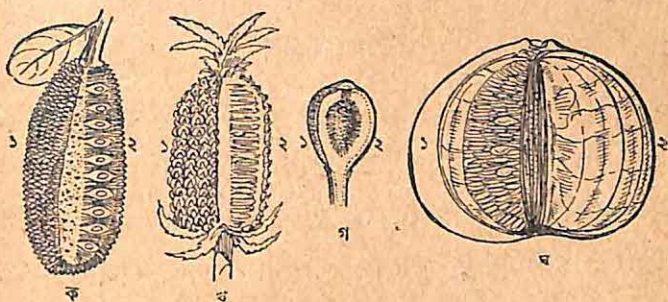
৮০নং চিত্র ক—কাঁটাল, খ—আনারস, গ—ডুমুর, ঘ—কমলালেবু ;
ক, খ, গএর ১—গোটা অংশ, ২—কাটা অংশ।
ঘএর ১—কাটা অংশ, ২—গোটা অংশ।

গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল দেখা যায়। ডুমুর পাকিলে ফুলের গর্ভকোষ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল হয়। উহাদিগকে আমরা ভুলক্রমে বীজ বলি। গর্ত্তটি ডুমুরের ফুলের মঞ্জরীর ফাঁপা দণ্ড।

ফলের সময়—বৎসরের সব সময়ে গাছে ফল হয় না। কেহ শীতে, কেহ গ্রীষ্মে, কেহ বর্ষায় ফলে। কেহ বার মাস ফল দেয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

বীজের গড়ন

বীজের গড়ন—আকন্দ (১), শিমূল (৪), করবী প্রভৃতি বীজের গায়ে তুলা থাকে। চোরকাঁটা, আপাং (৬), বাঘনখা বা ভাটুই প্রভৃতি বীজের গায়ে সরু শুয়ো বা গায়ে কাঁটা লাগিয়া থাকে। বিগোনিয়া, পারুল, সজিনা, চুকো-পালঙের ফলে কাগজের চেয়েও পাতলা ডানা জোড়া থাকে রেড়ীর বীজ ক্ষুদ্র
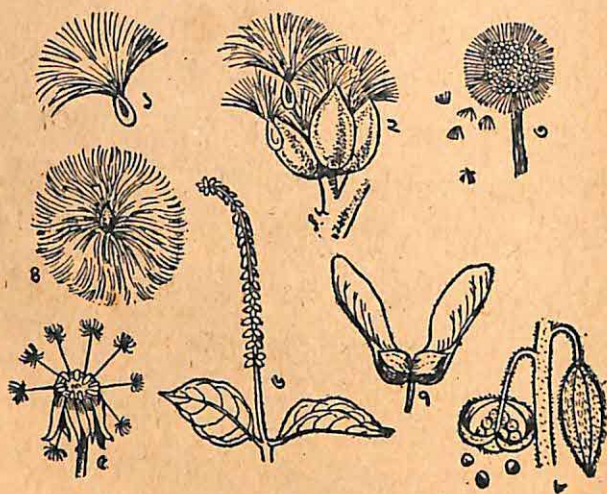
৮১নং চিত্র—বিভিন্ন রকমের বীজ।

উঁচু অংশে বিভক্ত দেখা যায়। জলে শালুক ফল ফাটিলে এক-প্রকায় আঠা বাহির হইয়া বীজগুলিকে একত্র করিয়া রাখে।

৮২নং চিত্র—বীজ বিস্তারের বিভিন্ন উপায়। ১—ডাব জলে ভাসিয়া অন্যত্র যাইতেছে। ২—শিমুলের বীজ তুলার সহিত বাতাসে ভাসিয়া অন্যত্র যাইতেছে। ৩—পাখী বীজ লইয়া যাইতেছে। ৪—পতঙ্গ বীজ লইয়া যাইতেছে। ৫—নৌকা হইতে ধান জলে পড়িয়া অন্যত্র যাইতেছে।

বীজের প্রকার-ভেদ—ছোলা, মটরের ভ্রূণের খাদ্য বীজপত্রের মধ্যস্থ শাঁস। এই সকল বীজকে অন্তঃসার বীজ বলে। ধান, ভুট্টার বীজে ভ্রূণের খাদ্য বীজপত্রের বাহিরে থাকে। ইহাদিগকে বহিঃসার বীজ বলে।

বীজ-বিস্তার—জল, বাতাস, পাখী ও পতঙ্গ দ্বারা বীজ এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় নীত হয়। গাছের তলায় যদি সমস্ত বীজ পড়ে তবে একসঙ্গে অল্প স্থানে অনেক গাছ জন্মিবে। কোন গাছই ইহাতে বাঁচে না। সেইজন্য গাছের বাঁচিবার জন্য বীজ বিস্তারের দরকার হয়।

সারাংশ—যে পাকা ফলে খোসা ফাটে তাহাকে স্ফোটক ফল, যে পাকা ফলের খোসা ফাটে না তাহাকে অস্ফোটক ফল বলে। বীজযুক্ত অস্ফোটক ফলকে বার্ত্তাকু ফল বলে। আঁটিযুক্ত অস্ফোটক ফলকে সাষ্টিক ফল বলে। একটি ফুল হইতে উৎপন্ন একটি ফলকে মৌলিক ফল, একটি ফুল হইতে উৎপন্ন বহুফলকে গুচ্ছ ফল, ফলের সমষ্টিকে যৌগিক ফল বলে।

প্রশ্ন

১। স্ফোটক ও অস্ফোটক ফল, মৌলিক, গুচ্ছ ও যৌগিক ফল কাহাকে বলে ? প্রত্যেক ফলের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

২। নিম্নলিখিত ফলগুলি কোন্ শ্রেণীর বল :—করবী, চাঁপা, আনারস, আতা, দোপাটি, মটরশুটী, শিম।

৩। বীজ বিস্তারের উপায়গুলি বল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মাটি

গাছ মাটি হইতে শিকড় দিয়া তাহার খাদ্য টানিয়া লয়। পাহাড়-পর্ব্বতের পাথর নানা কারণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মাটি হয়। মাটি সাধারণতঃ নিম্নের উপকরণ দিয়া গঠিত হয়; যথা:— **বালি, কাদা, চূণ** ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ এবং **পচা উদ্ভিদ্** ও **জীবজন্তুর দেহ**। মাটিতে বালি ও কাদার পরিমাণই বেশী থাকে। মাটিকে সাধারণতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা:—

বালি মাটি—বালি মাটিতে শতকরা ৯০ ভাগ বালি ও ১০ ভাগ কাদা থাকে। বেলে পাথর চুর্ণ হইয়া বালির উৎপত্তি হয়। ইহার ভিতরে উদ্ভিদের মূল জোরে আটকাইয়া থাকে না। বালি সহজে জল শোষণ করে বটে কিন্তু উহাতে জল দাঁড়ায় না। তলার ফুটাযুক্ত পাত্রে বালি রাখিয়া জল ঢালিলে জল নীচে চলিয়া যায়। এই কারণে খাঁটি বালি বা বেলে মাটি উদ্ভিদ্ জীবনের অনুপযোগী।

দো-আঁশ বা দো-রসা মাটি—ইহাতে শতকরা ৩০ হইতে ৬০ ভাগ কাদা ও অবশিষ্ট পচা পদার্থ থাকে। এই জাতীয় মাটিতে অধিক জল সঞ্চিত থাকে এবং ইহা লাঙ্গল দিয়া সহজে আলগা করা যায়। এইজন্য ইহা চাষের পক্ষে উপযোগী।

কাদা মাটি—ইহাতে ৭০।৮০ ভাগ কাদা থাকে।

এঁটেল মাটি—ইহাতে শতকরা ৮০।৯০ ভাগ কাদা থাকে। ইহার কণা খুব সূক্ষ্ম; সেইজন্য ইহা খুব আঁট হয়; এঁটেল মাটি

অধিক জল আট্‌কাইয়া বা ধরিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু ইহা সহজে জল শুষিতে পারে না ; ইহার ভিতর দিয়া বায়ু চলাচল করিতে পারে না। সেইজন্য ইহা চাষের পক্ষে উপযোগী নয়। চাষের জন্য এঁটেল মাটির সহিত বালি, গোবর ও নানা প্রকার সার পদার্থ মিশাইতে হয়।

চূণ—চুণে-পাথর হইতে চুণ পাওয়া যায়। রাম-খড়ি, ঘুটিং, চা-খড়ি পোড়াইলে চুণ উৎপন্ন হয়। ইহা উদ্ভিদের দেহ পুষ্ট করে। ইহার সাহায্যে গলিত গাছপালা ও জীবজন্তুর দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ভিদের উপযোগী সারবান্ পদার্থে পরিণত হয়। ইহা এঁটেল মাটিকে শিথিল করে এবং বালি মাটিকে আঁট করে।

গলিত উদ্ভিদ্ ও জীবদেহ—যে মাটিতে পচা গাছপালা বা জীবজন্তুর দেহ থাকে তাহা উর্ব্বরা। ইহা বালির মত সহজে জল চুষিতে পারে এবং এঁটেলের মত অধিক জল ধারণও করিতে পারে। সেইজন্য গলিত পদার্থ বেলে মাটির জল ধারণের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং এঁটেলের জল শোষণের শক্তি বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন

১। মাটির উপকরণ কি কি? বালি ও এঁটেলের মধ্যে পার্থক্য কি? (M. E. 1937)

২। মাটি কয় প্রকারের হয়? চুণ মাটির কি কি উপকার করে? গলিত উদ্ভিদ্ ও প্রাণী মাটির কি কোন কাজে লাগে?

৩। বাংলা দেশে কত রকম মাটি আছে? (M. E. 1935)

প্রাণি-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী জীব

জীবের শ্রেণী-বিভাগ—তোমরা পিঠে হাত দিয়া দেখ, পিঠের মাঝখানে ঘাড়ি হইতে কোমরের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত একটি হাড়ের দাঁড়া আছে। ইহাকে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া বলে। বানর, গরু, ভেড়া, ছাগল, পাখী, মাছ, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি জন্তুরও এইরূপ পিঠে মেরুদণ্ড আছে। ইহাদিগকে মেরুদণ্ডী (Vertebrate) বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের অন্যত্রও হাড় থাকে। মাছের কাঁটাই মাছের হাড়।

প্রজাপতি, কেঁচো, মাছি, মশা প্রভৃতি প্রাণী কাটিয়া দেখ, ইহাদের দেহে মেরুদণ্ড বা কোথাও একটু হাড় নাই। ইহাদিগকে অমেরুদণ্ডী (Invertebrate) বলে। ইহাদিগের দেহ আনায়াসে পিষিয়া ফেলিতে পার। পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তু মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

মেরুদণ্ডীর ও অমেরুদণ্ডীর মোটামুটি তুলনা— (১) মেরুদণ্ড কয়েকটি হাড় দিয়া গঠিত। মেরুদণ্ডীর মাথায় হাড়ের খুলি থাকে। অমেরুদণ্ডীর এ সব কিছুই নাই।

(২) অধিকাংশ মেরুদণ্ডী উপর-নীচ করিয়া চোয়াল নাড়ে। অমেরুদণ্ডী সকলের চোয়াল থাকে না। অমেরুদণ্ডীর মধ্যে যাহাদের চোয়াল আছে তাহারা চোয়াল বাম দিকে, ডান দিকে নাড়ে। (৩) অধিকাংশ মেরুদণ্ডী নাক দিয়া নিঃশ্বাস লইতে পারে ; অধিকাংশ অমেরুদণ্ডী লেজ, ঘাড় বা ত্বকের ছিদ্র দিয়া নিঃশ্বাস লয়। (৪) মেরুদণ্ডী দেহের সহিত কখনও দুই জোড়ার অধিক অঙ্গ (অর্থাৎ এক জোড়া পা ও এক জোড়া হাত, অথবা দুই জোড়া পা, অথবা এক জোড়া পা ও এক জোড়া ডানা, অথবা দুই জোড়া ডানা) যুক্ত থাকে না। অমেরুদণ্ডীর দেহে প্রায় দুই জোড়া অধিক অঙ্গ থাকে না। (৫) মেরুদণ্ডীর চক্ষু মস্তিষ্ক হইতে এবং অমেরুদণ্ডীর চক্ষু ত্বক হইতে উৎপন্ন হয়। (৬) মেরুদণ্ডীর হৃদয় পেটের দিকে অবস্থিত। অমেরুদণ্ডীর হৃদয় থাকিলেও পিঠের দিকে অবস্থিত।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী নয়টি পর্ব্বে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে সন্ধিপদ ও শম্বুক উচ্চস্থানীয়। চিংড়ি, ফড়িং, বিছা প্রভৃতি সন্ধিপদ পর্ব্বভুক্ত। ইহাদিগের পদ কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত বলিয়া ইহাদিগকে সন্ধিপদ বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিংড়ি

চিংড়িকে মাছ বলিলেও উহা প্রকৃত মাছ নয়। চিংড়ির দেহে কাঁটা (বা হাড়) নাই, চিংড়ি কাটিলে এক ফোঁটা রক্ত বাহির হয় না। ইহা অমেরুদণ্ডী জীব। ইহাদের পায়ে গিঁট বা সন্ধি আছে। ইহা **সন্ধিপদ** পর্ব্বভুক্ত। চিংড়ি মাছের ন্যায় জলে বাস করে এবং মাছের ন্যায় ইহার একটি পুচ্ছ থাকে। সাদা, কাল, লাল এবং ছোট, বড় গল্‌দা, বাগ্‌দা, কুচো, কাদা প্রভৃতি নানা প্রকারের চিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

বাসস্থান—চিংড়ি জলবাসী। পুকুর, খাল, বিল ও নদীর মিঠা জলে এবং সমুদ্রের লোণা জলে চিংড়ি বাস করে।

দেহ—একটি রেকাবিতে খানিকটা মোম গালাইয়া রাখ। একটি গল্‌দা চিংড়িকে মোমের উপর ভাল করিয়া ছাড়াইয়া পিন দিয়া আঁটিয়া দাও। এখন চিংড়ির দেহের বিভিন্ন অংশ ভাল করিয়া পরীক্ষা কর। দেখ, ইহার দেহ কেমন লম্বা ও নলাকৃতি। দেহে দুইটি প্রধান অংশ—**উদর** ও **শিরোবক্ষ**। মস্তক (শির) ও বক্ষ এক হইয়া শিরোবক্ষ হইয়াছে। সমস্ত দেহ কঠিন **খোলায়** আবৃত থাকে। খোলা চিংড়ির শরীরকে আঘাত হইতে রক্ষা করে। দেহ হইতে **কাইটিন** নামক পদার্থ নিঃসৃত হইয়া এই খোলা সৃষ্ট হয়।

(১) **উদর**—শিরোবক্ষের খোলা একটি কিন্তু উহাদের
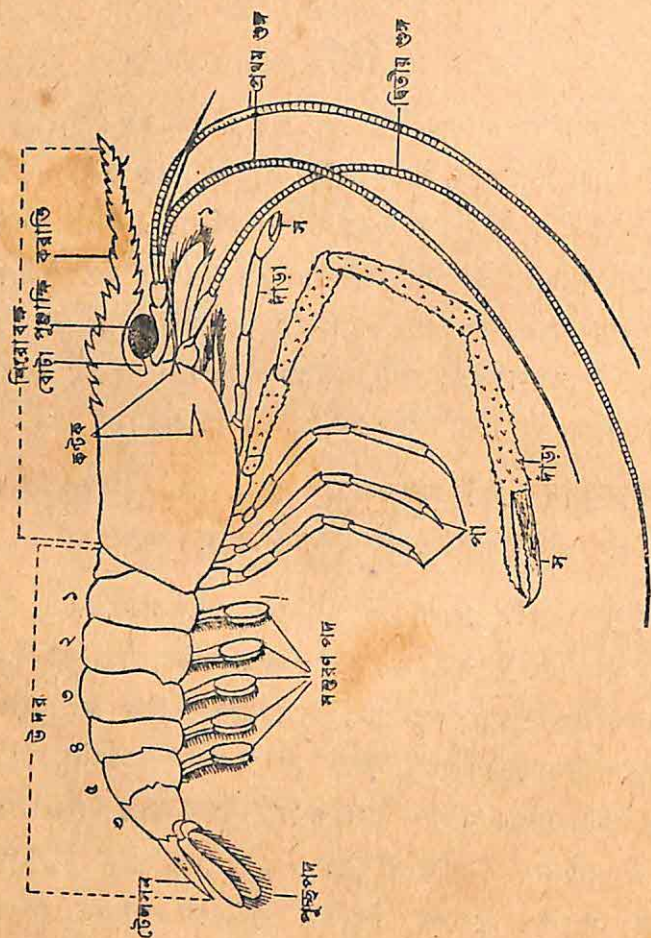
৩৭ নং চিত্র—চিংড়ি

খোলা সাতটি **আংটির** মত অংশে বিভক্ত। আংটিগুলি উপর নীচ নড়িতে পারে কিন্তু পার্শ্বে নড়ে না। উদয়ের প্রথম পাঁচটি

আংটির প্রত্যেকের গোড়া হইতে এক জোড়া **সন্তরণ-পদ** বাহির হইয়াছে। এই সকল পা দিয়া চিংড়ি সাঁতার দেয় বলিয়া ইহাদের অগ্রভাগ নৌকার দাঁড়ের মত চ্যাপ্টা ও পাতলা। উহাদের ষষ্ঠ আংটি (৮৩নং চিত্রে ৬) হইতে একজোড়া চ্যাপ্টা তিন-কোণা উপাঙ্গ বাহির হইয়াছে। ইহাকে **পুচ্ছপদ** বলে। পুচ্ছপদের উপরে মোচাকার সপ্তম খণ্ডকে **টেল্‌সন** বলে। টেল্‌সন ও পুচ্ছপদ দ্বারা চিংড়ি লাফাইয়া চলে কিংবা মুখ না ফিরাইয়া পিছু সাঁতরাইতে পারে। মাছ এইরূপ পারে না। চিংড়ির দেহ সোজা থাকে না, বাঁকিয়া থাকে।
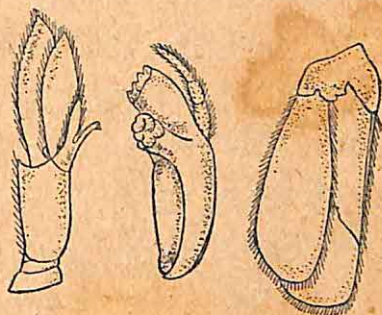
৮৪নং চিত্র—সন্তরণ পদ, ম্যাণ্ডিবল ও পুচ্ছপদ।

(২) **শিরোবক্ষ**—ইহা একটি বড় খোলা দিয়া ঢাকা। ইহাতে নিম্নলিখিত অংশগুলি আছে, যথা—

(ক) **করাতি**—এই খোলার অগ্রভাগ **করাতের** মত সরু। করাতের উপরে ও নীচে ধারাল **দাঁত** আছে। চিংড়ি করাতি দ্বারা আত্মরক্ষা করে।

(খ) **পুঞ্জাক্ষি**—করাতের গোড়ায় দুই পাশে পাতাহীন একটি করিয়া দুইটি বড় কাল **পুঞ্জাক্ষি** আছে। পুঞ্জাক্ষি অসংখ্য

ছোট চোখের সমষ্টি। পুঞ্জাক্ষি **বোঁটার** উপর অবস্থিত বলিয়া চিংড়ি ইহাদিগকে চারিধারে ঘুরাইতে পারে। পুঞ্জাক্ষির পশ্চাতে খোলের উপর দুইটি **কাঠির** (কন্তক) মত অঙ্গ আছে।

(গ) **শুঙ্গ**—পুঞ্জাক্ষির একটু নীচে লম্বা **কঠিন** অংশ (১) বাহির হইয়াছে। ইহার নীচের দিক্ হইতে এক **জোড়া লম্বা শুঙ্গ** (৮৩নং চিত্রে দ্বিতীয় শুঙ্গ) এবং উপয় দিক্ হইতে দুই তিনটি শাখা-বিশিষ্ট **একজোড়া ছোট শুঙ্গ** (৮৩নং চিত্রে প্রথম শুঙ্গ) বাহির হইয়াছে। ছোট শুঙ্গে একজোড়া ও বড় শুঙ্গে একটি **অনুভব যন্ত্র** আছে। ইহারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে। ছোট শুঙ্গ জোড়ার গোড়ায় থলির মধ্যে চিংড়ির **কাণ** থাকে।

(ঘ) **মুখ**—চিংড়ির মুখ পরীক্ষা কর। মুখ হইতে **আঙ্গুলের মত তিন জোড়া** অংশ বাহির হইয়াছে। (৮৩নং চিত্রে দেখান হয় নাই)। ছোট দুই জোড়ায় শুয়োর মত অংশ জোড়া থাকে। বড় জোড়াতে **দাঁত** আছে। এই জোড়াকে (Mandible) বলে। দাঁতগুলি খুব শক্ত ও ধারাল। চিংড়ি ছোট দুই জোড়া দিয়া খাদ্য মুখে আটকাইয়া রাখে এবং ম্যাণ্ডিবল দিয়া খাদ্য চিবাইয়া খায়।

(ঙ) **পা**—বক্ষের নীচে দুই ধারে পাঁচটি করিয়া দশটি **পা** (৮৩নং চিত্রে পাঁচটি দেখান হইয়াছে) আছে। প্রত্যেক পায়ে কয়েকটি খণ্ড আছে। সেইজন্য ইহাকে **সন্ধিপদ** বলে। প্রথম দু জোড়া পা মোটা ও উহাদের মাথায় **সাঁড়াশির** মত অংশ থাকে। ইহাদিগকে **দাঁড়া** বলে। দ্বিতীয় দাঁড়াটি খুব

লম্বা ও কাঁটাযুক্ত। দাঁড়া দিয়া চিংড়ি শিকার ধরে ও মুখে পূরে। করাতি ও দাঁড়া দিয়া চিংড়ি আত্মরক্ষা ও যুদ্ধ করে। শেষের তিন জোড়া পা (প) হাঁটিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বংশবৃদ্ধি—চিংড়ির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ আছে। স্ত্রী-চিংড়ির দ্বিতীয় দাঁড়াটি ছোট। স্ত্রী-চিংড়ি বর্ষাকালে অনেক ডিম প্রসব
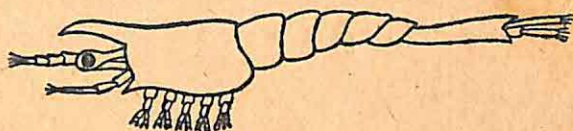
৮৫নং চিত্র—চিংড়ির বাচ্চা।

করে এবং ডিমগুলি শরীরের এক রকম আঠা দিয়া সন্তরণ পদের মধ্যে আট্‌কাইয়া রাখে। গল্‌দা চিংড়ির ডিম ফুটিয়া গল্‌দার মতই বাচ্চা বাহির হয়। কিন্তু অন্যান্য চিংড়ির বাচ্চার রূপান্তর ঘটে। চিংড়ির শরীর কঠিন খোলায় ঢাকা। ইহাতে চিংড়ি বাড়িতে পারে না ; সেইজন্য চিংড়ি মাঝে মাঝে খোলা বদলায়।

স্বভাব—চিংড়ি অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির এবং জলের মধ্যে ছোট প্রাণীদের সঙ্গে ঝগড়া ও লড়াই করে। অনেক সময় ইহাদিগকে খাইয়া ফেলে। চিংড়ির পা বা লেজের পাখ্‌না খসিয়া গেলে পুনরায় নূতন করিয়া গজায়। চিংড়ি নিশাচর। দিবাভাগে ইহারা গভীর জলে লুকাইয়া থাকে।

প্রশ্ন

১। চিংড়ির দেহ বর্ণনা কর। মাছের সঙ্গে ইহার প্রভেদ কি?

২। চিংড়ি কি করিয়া আহার করে? ইহায় কয় জোড়া পা আছে?

৩। চিংড়ি কি করিয়া বংশবৃদ্ধি করে? চিংড়ির স্বভাব বর্ণনা কর।

হাতের কাজ—বাজার হইতে একটি চিংড়ি কিনিয়া তাহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা কর। উহার দেহের বিভিন্ন অংশ খাতায় আঁক।

তৃতীয় অধ্যায়

গঙ্গা ফড়িং

গঙ্গা ফড়িঙের দেহে হাড় বা শিরদাঁড়া নাই। ইহারা অমেরুদণ্ডী জীব। ইহারা সন্ধিপদ পর্ব্বের অন্তর্গত মশা, মাছির ন্যায় **পতঙ্গ** বর্গভুক্ত। পুকুর ও অন্য জলাশয়ের ধারে ইহাদিগকে ডাঙ্গায় ডানা মেলিয়া উড়িতে দেখা যায়।

দেহ—একটি গঙ্গা ফড়িং ময়দার আঠা দিয়া কাগজে আট্‌কাইয়া দাও। আতসী কাচ দিয়া উহার দেহ পরীক্ষা কর। গঙ্গা ফড়িং ২।৩ ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহাদের পাখার ও লেজের রং লাল, হল্‌দে, সবুজ—নানা রকমের হয়। ইহাদের দেহ তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—**মস্তক, বক্ষ, উদর**।

মাথা—ইহাদের মাথা বেশ বড় ও চওড়া। মাথা ও বুকের মধ্যে সরু গলা। এই গলার জন্য ইহারা মাথা সহজেই এধার ওধার ঘুরাইতে পারে। মাথার উপর দুইধারে দুইটি খুব বড় **পুঞ্জাক্ষি** আছে। চোখের সাম্‌নে দুইটি সরু ও অতি ছোট শুঙ্গ আছে। শুঙ্গ স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে। চোখের নীচেই মুখ। মুখে কামড়াইবার জন্য শক্ত ও ধারাল দন্তযুক্ত দুইটি বড় **চোয়াল** (Mandible) আছে।
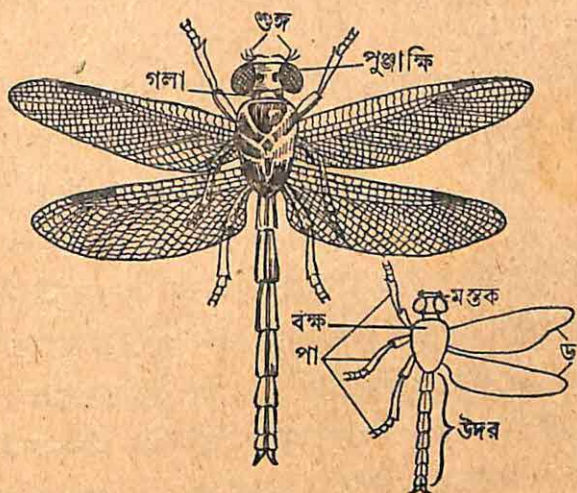
৮৭নং চিত্র—গঙ্গা ফড়িং। ডানদিকের চিত্র তিনটি পা ও দুইটি ডানা দেখান হইয়াছে।

বক্ষ—বুকে তিনটি **খণ্ড**। প্রত্যেক খণ্ড হইতে এক জোড়া সরু ও শক্ত **পা** বহির হইয়াছে। প্রত্যেক পায়ের শেষে আকর্ষীর মত যন্ত্র থাকে। ইহারা কখন পা দিয়া হাঁটে না।

ইহারা আকর্ষী দিয়া কোন কিছু ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারে এবং তাহা দিয়া শিকার শক্ত করিয়া ধরিতে ও মুখে গুঁজিয়া দিতে পারে।

গঙ্গা ফড়িংএর বুকে দুই জোড়া **ডানা** (ড) থাকে। ডানাগুলি এক মাপের এবং পাতলা, শক্ত, স্বচ্ছ, ঝক্‌ঝকে, লম্বা ও জালের মত শিরাযুক্ত। ইহারা কখনও ডানা গুটাইতে পারে না। ইহারা ডানার সাহায্যে সম্মুখ ও পার্শ্বে খুব দ্রুত উড়িতে পারে।

উদর—গঙ্গা ফড়িংএর **উদর** খুব লম্বা ও কতকগুলি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশের উভয় পার্শ্বে **শ্বাসছিদ্র** আছে। এই ছিদ্র দিয়া বায়ুনালীতে বাতাস লয়। পেটের শেষে সাঁড়াশির মত যন্ত্র থাকে।

জীবন-বৃত্তান্ত—গঙ্গা ফড়িঙের জীবন-কথা বড়ই মজার; স্ত্রী-ফড়িং কোন জলজ লতা-পাতা, ঘাস বা গাছের ডগায় **ডিম** পাড়ে। ডিম জলে পড়িয়া যায়। ইহারা ডিমের কোন যত্ন লয় না। এক মাস পরে ডিমগুলি আপনা হইতেই ফুটিয়া যায় এবং **শূককীট** বাহির হয়। শূককীট জলেই থাকে। প্রথমে ইহাদের প্রকাণ্ড মাথা, পুঞ্জাক্ষি ও অতি ছোট শুঙ্গ থাকে। শূককীট দেহের সঞ্চিত খাদ্য খায় এবং কয়েকটি ফুল্‌কার মত রোম দিয়া শ্বাস লয়। এই অবস্থায় ইহারা বহুবার খোলস ছাড়ে; তারপর ইহাদের অল্প অল্প ডানা গজায়। এই অবস্থায় ইহারা পোকামাকড় খায়। শেষকালে উহারা কোন গাছের ডাল বা

বাঁশ ধরিয়া জলের সীমানায় আসিয়া বসিয়া থাকে এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। ইহাদের পিঠের চামড়া ফাটিয়া যায়, পরে পূর্ণ ফড়িং বাহির হইয়া আসে। বাচ্চা-অবস্থায় ইহারা জলের মধ্যে এক হইতে তিন বৎসর বাস করে। কিন্তু পূর্ণ ফড়িং দুই তিন মাসেই মারা যায়। গঙ্গা ফড়িং ছোট-ছোট পোকা-মাকড় খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

প্রশ্ন

১। গঙ্গা ফড়িঙের দেহ বর্ণনা কর।

২। গঙ্গা ফড়িং এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় কি করিয়া যায়? ইহারা ডিম পাড়ে কোথায়? ইহারা কি করিয়া খায়?

৩। ডিম হইতে পূর্ণাঙ্গ ফড়িং বাহির হওয়ার প্রণালী বর্ণনা কর।

হাতের কাজ—একটা গঙ্গা ফড়িং যোগাড় করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশ খাতায় আঁক।

চতুর্থ অধ্যায়

স্থল-শামুক

শামুকের দেহে হাড় বা কাঁটা নাই। ইহার দেহ শুধু নরম মাংসে গঠিত। সুতরাং ইহারা **অমেরুদণ্ডী** জীব। অমেরুদণ্ডীর মধ্যে শামুক উচ্চ স্তরের জীব। সন্ধিপদ দ্রুত চলে, শামুক ধীরে ধীরে চলে।

বাসস্থান—শামুক নানা রকমের হয়। কতকগুলি জলে থাকে। স্থল-শামুককে বার্ষাকালে স্যাঁতসেতে জায়গায় দেখা যায়। দিনে ইহারা লুকাইয়া থাকে, রাত্রে আহারের অন্বেষণে বাহির হয়।

দেহ—একটি স্থল-শামুক যোগাড় কর। প্রথমে ইহার খোলা পরীক্ষা কর। তৎপর খোলা ভাঙ্গিয়া ভিতরের মাংস পরীক্ষা কর।

খোলা—স্থল-শামুকের দেহ একটি কোমল মাংসপিণ্ড। সেইজন্য দেহের উপর খয়ের রঙের কুণ্ডলী পাকান **শক্ত খোলা** থাকে। খোলা যেন তাহার ঘর। শামুক তাহার ঘরখানি পিঠে করিয়া বেড়ায়। জল-শামুকের খোলার মুখে ঢাক্‌নি আছে। স্থল-শামুকে তাহা নাই। খোলাটি ডান দিকে পাক খাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সরু হইয়া উপরের দিকে উঠিয়াছে।

সামান্য আঘাত বা বাধা পাইলেই শামুক খোলার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। খোলা চূণ জাতীয় পদার্থ দ্বারা তৈয়ারি। খোলায়
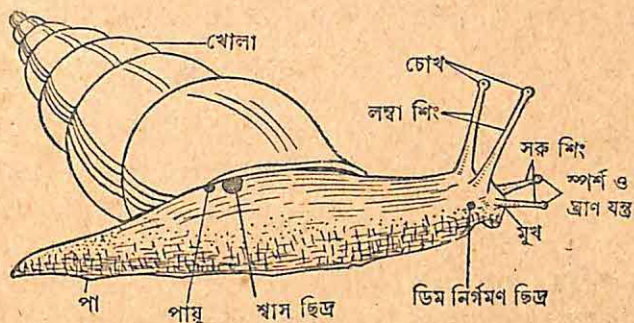
৮৭নং চিত্র—স্থল-শামুক।

ভিতরটা খুব সাদা ও চক্‌চকে। খোলার ভিতর গায়ে মাংস-পিণ্ডের উপর পাতলা **পরদা** থাকে।

মাথা—দেহের অগ্রভাগকে মাথা বলে। মাথাটি ছোট। মাথায় শিংএর মত চারিটি ফাঁপা ও সঙ্কোচনশীল গঠন আছে; পিছনের শিং দুইটি লম্বা, সামনের শিং দুইটি ছোট। সামনের দুইটি ঘ্রাণ ও স্পর্শ শক্তিসম্পন্ন। ডাঙ্গায় চলিবার সময় শামুক শিংগুলি বাহির করিয়া রাখে। লম্বা শিংএর ডগায় ইহাদের কাল বিন্দুর মত দুই **চোখ** আছে। চোখ দিয়া ইহারা আলো অনুভব করিতে পারে কিন্তু কিছুই দেখিতে পায় না। শামুক শিংগুলিকে ইচ্ছামত গুটাইতে বা লম্বা করিতে পারে। মাথায় একটি **ছোট ছিদ্র** আছে। ইহা দিয়া **ডিম** বাহির হয়।

মুখ—শামুকের মাথার নীচের ছিদ্রটি ইহার মুখ। ইহাদের **মুখ** বড়। মুখের ভিতর উপর দিকে দুই পার্শ্বে **চোয়াল** এবং নীচের দিকে **লম্বা ফিতার** উপর ক্ষুদ্র ও ধারাল **দাঁত** বসান আছে। এই দাঁতের সাহায্যে ইহারা খাদ্য কুরিয়া কুরিয়া খায়। দাঁতগুলি শীঘ্র ক্ষয় হইয়া যায়; নূতন দাঁত গজায়।
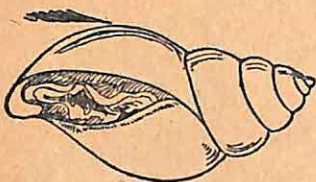
৮৮নং চিত্র—স্থল-শামুক।
খোলার মধ্যে গুটান অবস্থায়।

শ্বাসযন্ত্র—স্থল-শামুক ফুস-ফুস দিয়া শ্বাসকার্য্য চালায়। দেহের উপর মাঝখানে একটি বড় ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া ফুসফুসের শ্বাসক্রিয়ার জন্য শামুক বাতাস টানিয়া লয়। শ্বাস ছিদ্রের পার্শ্বেই **পায়ু**।

পা—স্থল-শামুকের শরীরের শেষের নিম্ন অংশকে **পা** বলে। পায়ের অগ্রভাগ চওড়া ও পিছন সরু। চলিবার সময় খোলাটি পিছন দিকে হেলান থাকে। পা হইতে এক রকম লালা বাহির করিয়া পথকে পিছল করিয়া লয়। ইহারা ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়া চলে।

স্বভাব—স্থল-শামুক নিরীহ প্রকৃতির জীব। শীতকালে মাটির তলায় যায় এবং দেহ হইতে এক প্রকার আঠা বাহির করিয়া খোলার মুখ বন্ধ করে; আঠা শুকাইলে ঢাকনি শক্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় না খাইয়া বহুদিন বাঁচিয়া থাকে। ইহারা ডাঙ্গায় গাছপালা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

বংশবৃদ্ধি—স্থল-শামুক বর্ষাকালে মাটিতে গর্ত্ত করিয়া একসঙ্গে প্রায় ৫০ হইতে ১০০ ডিম পাড়ে এবং গর্ত্তের মুখ বন্ধ করে। তিন সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। ডিমগুলি মটরের মত সাদা ও গোলাকার।

সারাংশ

গল্দা চিংড়ি	গঙ্গা ফড়িং	স্থল-শামুক
১। দেহে দুই ভাগ —শিরোবক্ষ ও উদর	১। দেহের তিনভাগ —মাথা, বুক ও উদর	১। দেহের ভাগ অস্পষ্ট।
২। দেহ কাইটিন নামক পদার্থে আবৃত।	২। দেহ কাইটিন নামক পদার্থে আবৃত	২। দেহ চুণ জাতীয় খোলায় আবৃত।
৩। দুই জোড়া শুঙ্গ।	৩। এক জোড়া শুঙ্গ।	৩। দুই জোড়া শুঙ্গ।
৪। বুকে ৮ জোড়া উপাঙ্গ, শেষ জোড়া হাঁটিবার পা।	৪। বুকে ৩ জোড় পা।	৪। মাংসল পা।
৫। উদরে ৬ জোড়া সন্তরণ পদ।	৫। উদরে কোন উপাঙ্গ নাই।	৫। উদরে কোন উপাঙ্গ নাই।
৬। ডানা নাই।	৬। দুই জোড়া পাতলা ডানা।	৬। ডানা নাই।
৭। স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন।	৭। স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন।	৭। উভলিঙ্গ।
৮। জলবাসী।	৮। প্রথমে জলবাসী পরে স্থলবাসী।	৮। স্থলবাসী।

প্রশ্ন

১। স্থল-শামুকের আকৃতি ও প্রকৃতি বর্ণণা কর। (M. E. 1938)
২। ইহারা কি করিয়া চলে।
৩। স্থল-শামুকের জীবন বৃত্তান্ত বল। (M. E. 1939)
৪। শামুক কি করিয়া শ্বাস গ্রহণ করে ? (M. E. 1934)

হাতের কাজ—একটি স্থল-শামুক যোগাড় করিয়া তাহার খোলা ভাঙ্গিয়া ফেল। ইহার বিভিন্ন অংশ খাতায় আঁক।

পঞ্চম অধ্যায়

মেরুদণ্ডী জীব

মেরুদণ্ডীর সাধারণ বাহ্যিক গঠন—মেরুদণ্ডী প্রাণী পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা—**মৎস, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী** ও **স্তন্যপায়ী**। মৎস্য সকলের নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী। সাধারণতঃ মেরুদণ্ডীর দেহ তিন অংশে বিভক্ত হয়, যথা—**মস্তক, দেহকাণ্ড** ও **পুচ্ছ** বা **লেজ**। দেহের ডান ও বামদিকে **সমান গঠনাদি** দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীর মেরুদণ্ডীর যথা মানুষ বা পাখীর **ঘাড়** আছে। মাছ, ব্যাঙ্, প্রভৃতি নিম্নশ্রেণী মেরুদণ্ডীর ঘাড় নাই। মেরুদণ্ডীর দেহকাণ্ড ও লেজের সন্ধিস্থলে পায়ু থাকে। মেরু-দণ্ডীর মাথায় **মুখ, চোখ, নাক** ও **কাণ** থাকে। দেহকাণ্ডের সাম্‌নে এক জোড়া **পাখ্‌না** বা **ডানা** বা **পা** বা **হাত** থাকে

এবং পিছনে এক জোড়া পাখ্‌না বা পা থাকে। প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল থাকে। উচ্চশ্রেণী মেরুদণ্ডীর ইহাই প্রধান লক্ষণ। প্রত্যেক মেরুদণ্ডীর শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বিভিন্ন
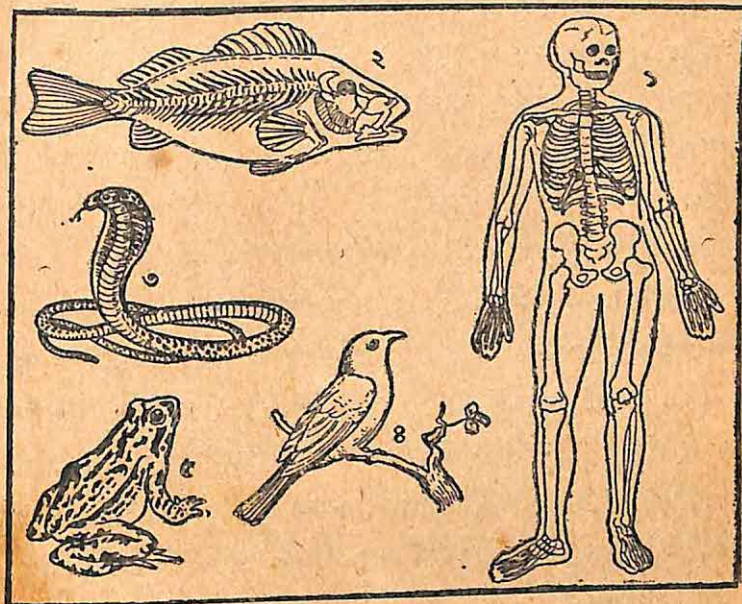
৮৯নং চিত্র—মেরুদণ্ডী জীব।
১—স্তন্যপায়ী (মানুষ), ২—মাছ, ৩—সরীসৃপ (সাপ),
৪—পাখী, ৫—উভচর (ব্যাঙ)।

যন্ত্র থাকে। স্তন্যপায়ী ছাড়া সকল মেরুদণ্ডী ডিম প্রসব করে, ডিম হইতে ছানা হয়। মেরুদণ্ডীর দেহ **ত্বক** দ্বারা আবৃত থাকে।

উভচর—ব্যাঙ উভচর প্রাণী। জলচর ব্যাঙাচি ও মাছের

ফুল্‌কা আছে কিন্তু স্থলচর ব্যাঙের ফুসফুস থাকে। মাছের পাখ্‌না ও আঁশ থাকে। ব্যাঙের রক্ত ঠাণ্ডা।

সরীসৃপ—সাপ, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, কুমীর, কচ্ছপ প্রভৃতিকে **সরীসৃপ** বলে। ইহারা জলে অথবা স্থলে বাস করে। সরীসৃপের রক্ত অত্যন্ত শীতল। কুমীর ছাড়া অন্য সরীসৃপের মাথা ছোট। কচ্ছপ ব্যতীত সকল সরীসৃপের দাঁত থাকে। সাপ ভিন্ন সকল সরীসৃপের চারিটি পা থাকে। সাপ বুকে হাঁটিয়া চলে। সরীসৃপের লেজ্‌ ও ফুস্‌ফুস্‌ এবং আঁশ থাকে। কচ্ছপের আবরণ ও কুমীরের পিঠ হাড়ের মত শক্ত।

পক্ষী—পাখীর শরীর পালকে ঢাকা। পাখীর উড়িবার জন্য হাড়যুক্ত ডানা আছে। পাখীর মুখে দাঁতের বদলে তীক্ষ্ণ বাঁকা, চ্যাপ্টা ছোট বা বড় ঠোঁট আছে। পাখীর দুই পায়ে চারিটি করিয়া নখযুক্ত আঙ্গুল আছে। তিনটি আঙ্গুল সামনে, একটি পিছনে। আঙ্গুলগুলি আঁশের মত জিনিষ দ্বারা ঢাকা থাকে। জলচর পাখীর (হাঁস) আঙ্গুল পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া থাকে।

স্তন্যপায়ীর ও মাছের বিষয় পরে বলা হইতেছে।

প্রশ্ন

১। মেরুদণ্ডী কাহাকে বলে ? ইহারা কয়ভাগে বিভক্ত ? ইহাদের সাধারণ বিশেষত্ব বর্ণনা করে।

২। সরীসৃপ কাহাকে বলে ? পাখীদের সহিত ইহাদের কি কি বিষয়ে মিল দেখা যায় ? (M. E. 1938)

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৎস্য

মৎস্য নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী। ইহারা জলে বাস করে। জল হইতে উঠাইলে বেশীক্ষণ বাঁচে না।

দেহ-পরীক্ষা—একটি রুই মাছের দেহ ভাল করিয়া পরীক্ষা কর।

আকার—মাছের দেহ পটলের মত মাঝখানে মোটা এবং মাথা ও লেজের দিকটা সরু। এইজন্য ইহারা অনায়াসে জল ভেদ করিয়া যায়।

আঁশ—দেখ, মাছের দেহের উপর এক প্রকার **তেলা** আচ্ছাদন আছে। ইহার জন্য মাছের দেহ জলে ভিজে না এবং মাছ ধরিতে গেলে পিছলাইয়া যায়। সেইজন্য মাছ কুটিবার সময় ছাই দরকার হয়। তেলা পদার্থের নীচে মাথা ছাড়া মাছের সর্ব্বাঙ্গে **আঁশ** থাকে। কই, ল্যাটা মাছের মাথায়ও আঁশ আছে। আঁশগুলি মাছের গায়ে লেজের দিকে মুখ করিয়া সাজান থাকে। ইহাতে মাছ সাম্‌নে সাঁতরাইতে বাধা পায় না। শিঙ্গি, মাগুর মাছের আঁশ থাকে না। আঁশ মাছকে আঘাত হইতে রক্ষা করে।

পরীক্ষা—একটি বড় গামলায় একটি জীবন্ত রুই মাছের বাচ্চা ছাড়িয়া দাও। উহার কোথায় কয়টি পাখ্‌না আছে দেখ এবং উহারা কিরূপভাবে পাখ্‌না নাড়ে দেখ।

পাখ্না—হাত-পায়ের বদলে মাছের নরম ও কাঁটাযুক্ত কয়েকটি **পাখ্না** (Fin) আছে ; যথা :—(১) লেজে একখানি ; (২) পায়ুর পশ্চাতে একখানি, (৩) পেটের দুই পাশে দুইখানি, (৪) বুকে কান্কুয়ার দুইপাশে দুইখানে, (৫) পিঠে একখানি
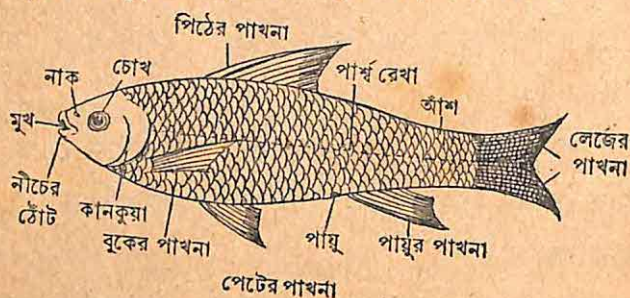
৯০নঃ চিত্র—রুইমাছ

পাখ্না। ইহাদিগের মধ্যে বুকের ও পেটের পাখ্নাগুলিকে **যুগ্ম পাখ্না** (Paired Fin) বলে। কারণ ইহারা এক জোড়া করিয়া থাকে। প্রত্যেক পাখ্না পৃথক্ কাজ করে। লেজের পাখ্না নৌকার হালের মত মাছকে ডাইনে বামে ঘুরিতে এবং মাছকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। অন্যান্য পাখ্নাগুলি নৌকার দাঁড়ের মত উপর-নীচে নড়ে। ইহারা মাছকে জল কাটিতে সাহায্যে করে। পাখ্নার ঝাপ্টায় মাছ আত্মরক্ষা ও শিকার করে। পিঠের দিকে বেশী হাড়-কাঁটার জন্য ভারী হয়। কিন্তু জীবন্ত মাছ বুকের ও পেটের পাখ্নার সাহায্যে পেট ও পিঠের ভার সমান করিয়া রাখে।

পরীক্ষা—জীবন্ত মাছের বুকের দুইখানি পাখনা কাটিয়া

মাছকে গামলার জলে ছাড়িয়া দাও। দেখ, মাছের মাথা নীচের দিকে নুইয়া পড়িতেছে। এক ধারের পাখ্না কাট। দেখ, মাছটি সেই দিকে হেলিয়া পড়ে।

মাথা—রুই মাছের মাথা বড়। মাথায় দুইটি বড় **চোখ** আছে। চোখের কোন পাতা নাই; সেইজন্য ইহারা কখনও চোখ বুজিতে পারে না। ঘুমাইবার সময়ও ইহারা চোখ মেলিয়া থাকে। চোখের কাল মণিটা খুব বড়। বাহির হইতে মাছের কাণ বোঝা যায় না। মাছ মাথার হাড় দিয়া বাহিরের শব্দ বুঝিতে পারে।

মুখ—রুই মাছের একটি মুখ আছে। ইহার হাঁ খুব বড়। মুখের উপর ও নীচে দুইটি **ওষ্ঠ** আছে। ওষ্ঠদ্বয়ের জোড়ের মুখে দুইটি ক্ষুদ্র নরম গঠন আছে। ইহারা স্পর্শশক্তিসম্পন্ন। মুখের পিছনে উপর দিকে দুইটি **নাকের ছিদ্র** আছে; নাকের ছিদ্রের সঙ্গে মুখের যোগ নাই। মৃগেল, রুই, কাতলা প্রভৃতি আঁশযুক্ত মাছ। তাহাদের গায়ে **পার্শ্ব-রেখা** দিয়া জলের মৃদু স্পন্দন অনুভব করে। বোয়াল, শিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি আঁশহীন মাছ মুখের **গোঁফ** দিয়া স্পর্শ অনুভব করে।

পরীক্ষা—এক গামলা জলে একটি জীবন্ত রুই মাছ ছাড়িয়া দিয়া উহার কান্কো ও মুখ কি করিতেছে দেখ। খলিসা বা কৈ মাছ লইয়া পরীক্ষা করিলে এই শ্বাসক্রিয়া অতি সুন্দর দেখা যাইবে।

শ্বাসযন্ত্র—জলের সঙ্গে যে অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকে তাহাই

মাছ প্রশ্বাস লয়। **মাছ নাক দিয়া শ্বাস লয় না।** মাথার দুই পাশে হাড়ের দুইটি **কান্‌কুয়া** থাকে। কান্‌কুয়ার একধার মাছের গায়ের সঙ্গে আঁটা থাকে এবং একধার আল্‌গা থাকে। প্রত্যেক কান্‌কুয়ার মধ্যে চিরুণীর দাঁতের মত **ফুলকা** আছে। টাটকা মাছে রক্তের জন্য ফুল্‌কাকে লাল দেখায়। পচা মাছে এই ফুল্‌কা প্রায় রক্তহীন হয়। মাছ কানকুয়া বন্ধ করিয়া মুখ হাঁ করিয়া প্রথমে মুখের মধ্যে জল লয় এবং পরে মুখ বন্ধ করিলে ঐ জল ফুল্‌কায় যায় এবং পরে
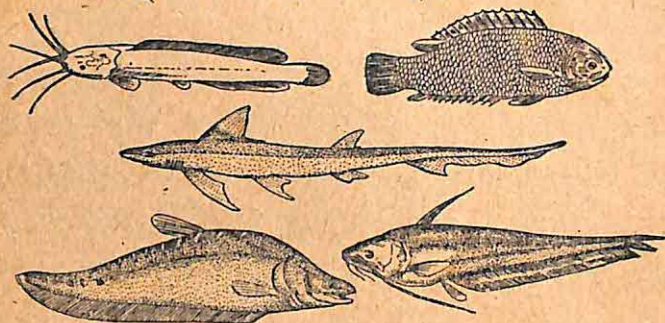
৯১নং চিত্র—বিভিন্ন রকমের মাছ।

কানকুয়া দিয়া বাহির হয়। জল বাহির হইবার সময় জলের সঙ্গে মিশ্রিত অক্সিজেন ফুল্‌কার পাতলা পর্দ্দা ভেদ করিয়া রক্তের মধ্যে মিশিয়া যায়। মাছ সাক্ষাৎভাবে বাতাস হইতে অক্সিজেন লয়। স্থলে মাছ জল লইতে পারে না। সেইজন্য স্থলে মাছ মরিয়া যায়।

বিভিন্ন রকমের মাছ—বিভিন্ন জলে মাছের আকার

ও প্রকৃতি ভিন্ন হয়। কতকগুলি সামুদ্রিক মাছ খুব নরম ; যথা—হাঙ্গর। মিঠা জলেই রুই, কাতলা, কই, বোয়াল, বাটা পুঁটি, শিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি নানা রকমের মাছ দেখা যায়। কই মাছের পিঠের ও পেটের ডানা দৈর্ঘ্যে বড়। এই ডানাগুলি অনেক কাঁটা যুক্ত। ইহাদের ডানা অবিভক্ত। কই মাছের ফুলকার কাছে খানিকটা বাতাস সঞ্চয় করিবার স্থান আছে। ফুলকার পরে অবস্থিত অতিরিক্ত যন্ত্র দ্বারা ইহারা জলের বাহিরে শ্বাসকার্য্য চালায়। সেইজন্য ইহারা স্থলে অনেকক্ষণ বাঁচিতে পারে। লাঠা ও শোল মাছের মুখ চ্যাপ্টা। শিঙ্গী, মাগুর, বোয়াল, পাপদা মাছের আঁশ নাই। চাঁদা মাছ খুব চ্যাপ্টা। পাকা রুই লাল রংয়ের হয়। মৃগেলের পিঠ খুব কাল। খয়ের, পাপদা, ইলিশ, সাদা মাগুর মাছের রং কটা।

চিতল ও ফলুই শিকারী মাছ। সেইজন্য ইহাদের সারি সারি দাঁত আছে। ইহারা ছোট মাছ খায় এবং গভীর জলে থাকে। চিতলের পিঠ ও ফলুয়ের পেট বেশী বাঁকা।

প্রশ্ন

১। মৎস্য-শরীরের প্রধান অঙ্গগুলির নাম কর এবং তাহাদের আবশ্যকতা বর্ণনা কর। (M. E. 1937) ইহার একটি ছবি আঁক। ২। মাছের আঁশের প্রয়োজন কি? মাছের পাখ্‌না মাছের কোন্‌ কাজ করে? ৩। মাছ কি করিয়া দেহের মধ্যে বাতাস গ্রহণ করে? মাছ স্থলে মরে কেন? (M. E. 1939). ৪। গলদা চিংড়ি, কাৎলা, কই মাছের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য চিত্রসহ বর্ণনা কর। (M. E. 1939) ৫। মাছের পাখ্‌নার প্রয়োজন কি? মাছ কিরূপে বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে? (M. E. 1935).

সপ্তম অধ্যায়

স্তন্যপায়ী জন্তু

স্তন্যপায়ীর সাধারণ লক্ষণ :—মানুষ, গরু, কুকুর, বিড়াল হাতী, বাঘ প্রভৃতি প্রাণী একেবারে বাচ্চা প্রসব করে। ইহারা কখনও ডিম পাড়ে না। ইহাদের স্ত্রীপুরুষ সকলেরই **স্তনগ্রন্থি** আছে। বাচ্চারা মাতার স্তনের দুধ পান করিয়া বড় হয়। সেইজন্য ইহাদিগকে **স্তন্যপায়ী** (Mammal) বলা হয়। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী স্থলচর কিন্তু জলচর স্তন্যপায়ীও আছে। ইহারাও ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য্য চালায় ; যেমন তিমি, শুশুক, সিন্ধুঘোটক।

স্তন্যপায়ী দেহ **মাথা, মধ্য-শরীর, হাত** ও **পা** লইয়া গঠিত। স্তন্যপায়ীর শরীর **লোমে** ঢাকা। তিমি ও মানুষের গায়ে লোম কম। স্তন্যপায়ীর মাথায় **নাক, মুখ, চোখ, কাণ** থাকে। চোখে উপর ও নীচে রোমযুক্ত **পাতা** থাকে। কর্ণছিদ্র ঘিরিয়া **বহিঃকর্ণ** (Pinna) থাকে। ইহাদের শ্রবণশক্তি প্রখর। স্তন্যপায়ীর মধ্য-শরীরে **চারিটি অঙ্গ**—চারিটি পা, কিম্বা দুইটি পা ও দুইটি হাত থাকে। হাত ও পায়ের তিনটি অংশ থাকে। প্রত্যেক স্তন্যপায়ী **ফুসফুস** দিয়া শ্বাসকার্য্য চালায়।

যে সকল প্রাণী মাংস দুধ প্রভৃতি খায় তাহারা মাংসাশী প্রাণী। যে সকল প্রাণী ঘাস, পাতা বা উদ্ভিদ্ খায় তাহারা

উদ্ভিজ্জাশী বা তৃণভোজী প্রাণী। মাংসাশী ও স্তন্যপায়ী কুকুরের পায়ে থাবা থাকে। প্রত্যেক থাবায় নখযুক্ত ৪।৫টি আঙ্গুল থাকে। তৃণভোজী স্তন্যপায়ীর পা খুব বলিষ্ঠ ও লম্বা
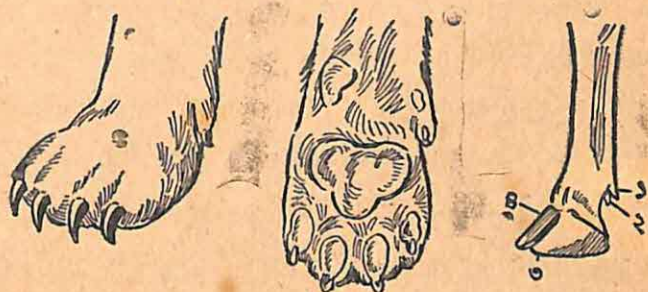
৯২নং চিত্র—কুকুরের থাবা ও গরুর খুর।

এবং পায়ে খুর আছে। কাহারও কাহারও শিং আছে। স্তন্যপায়ী অনেক রকমের হয়; তন্মধ্যে **মাংসাশী** কুকুর ও **খুরীবর্গ** গরুর কথা বলিব।

কুকুর

দেহ—কুকুর মাংসাশী, চতুষ্পদ জন্তু। একটি কুকুর পরীক্ষা কর। দেখ, ইহার দেহ **মাথা, গলা, ধড়, পা** ও **লেজ** এই কয়টি ভাগে বিভক্ত। পেট ও বুক লইয়া ধড়; মাংস ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য। মাংস কম পরিমাণে খায় বলিয়া কুকুরের পেট বড় হয় না। কুকুরের গ্রীবা লম্বা হয় না; কুকুরের কোমর সরু হয়। কুকুরের দেহ কোমল লোমে আবৃত থাকে।

মাথা—কুকুরের একটি গোল মাথা আছে। ইহাদের

নাক বড় ও সূচাল। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল। কুকুরের মাথায় দুইটি গোলাকার **চোখ** এবং একটি লম্বা **মুখ** আছে। বুলডগের মুখ থ্যাব্ড়া। কুকুরের মুখে গোঁফ নাই। চোখে তিন প্রকার পাতা থাকে। মুখে একটি **জিভ্** আছে। জিভ্ কোমল মসৃণ ও লম্বা। কুকুর জিভ্ দিয়া তরল পদার্থ লেহন করে। কুকুরের মাথায় দুইটি **কান** আছে। কাহারও কাণ খাড়া থাকে, কাহারও কাণ ঝুলান ও বড় হয়। কুকুরের শ্রবণশক্তি খুব প্রবল; সেইজন্য ইহাদের ঘুম খুব সজাগ।

দাঁত—কুকুরের চোয়াল ও দাঁত মাংস আহারের উপযোগী;
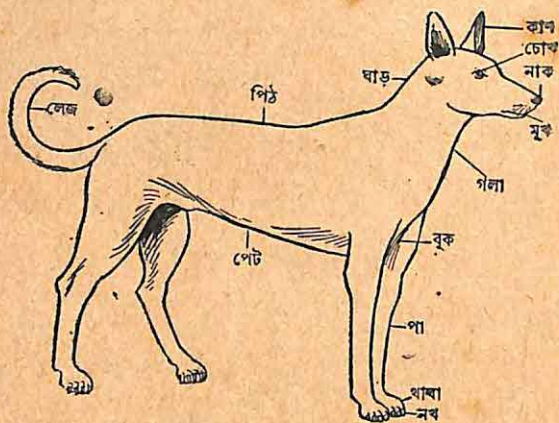
৯৩নং চিত্র—কুকুর।

দাঁতগুলি ধারাল। দুই চোয়ালের সামনে দুইটি লম্বা ও সূঁচের মত ধারাল দাঁত আছে। ইহা দিয়া কুকুর মাংস ছিঁড়ে। ইহাদিগকে **শ্বদন্ত** বলে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক পাটিতে ৬টি ছেদক

দন্ত (Incisor), ১২টি পেষক দন্ত (Molar ও Premolar), নীচের পাটিতে ২টি অধিক পেষক দন্ত আছে। ইহাদিগের সাহায্যে কুকুর হাড় ও মাংস ছেদন, চর্ব্বণ ও পেষণ করে।

৯৪নং চিত্র—কুকুরের ও গরুর প্রত্যেক পাটির অর্দ্ধেক দাঁত।

লেজ—কুকুরের লেজ মোটা ও লোমশ হয় এবং লেজের শেষাংশ বাঁকান হয়. লেজ নাড়িয়া কুকুর আনন্দ প্রকাশ করে।

পা—কুকুরের চারিটি বলিষ্ঠ **পা** আছে। ইহারা দ্রুত দৌড়াইতে পারে। সম্মুখের পা দুইটি একটু ছোট। প্রত্যেক পা তিন ভাগে ভাঁজ করা। প্রথম ভাগে **থাবা** থাকে। থাবার নীচে গদির ন্যায় মাংস আছে। থাবায় **বাঁকা নখযুক্ত আঙ্গুল** থাকে। সম্মুখের পায়ের থাবায় পাঁচটি ও পিছনের পায়ের থাবায় চারিটি করিয়া আঙ্গুল আছে (৯২নং চিত্র)। ইহারা আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া চলে। বিড়ালের নখের মত কুকুর তাহার নখগুলি গুটাইতে পারে না।

কুকুরের স্বভাব—কুকুর সহজেই পোষ মানে। ইহারা

বুদ্ধিমান, প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী। ইহারা গৃহস্থের বাড়ী পাহারা দেয় এবং শিকার করিতে আমাদিগকে সাহায্য করে।

কুকুরের গা ঘামে না। কুকুর পরিশ্রান্ত হইলে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে এবং জিহ্বা দিয়া জল পড়ে। উহাই

৯৫নং চিত্র—নানারকম কুকুরের মাথা, মুখ, নাক, কাণ লক্ষ্য কর।

ঘাম। দূষিত পদার্থ বাহির করিবার জন্য কুকুর ঘন ঘন প্রস্রাব করে।

বংশবৃদ্ধি—কুকুর এক সঙ্গে ৩-৭টা পর্য্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। স্ত্রী কুকুর দুই সারিতে ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত স্তন থাকে।

গরু

গরুর দেহও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—**মাথা, গলা, পেট** ও **বুক** লইয়া ধড়, **লেজ** ও **পা**। গরু তৃণভোজী বলিয়া স্থূলকায় প্রাণী এবং আকারে প্রায় তিন হাত উচ্চ ও চারি হাত লম্বা হয়। গরুকে প্রচুর পরিমাণে ঘাস, পাতা প্রভৃতি খাইতে হয় বলিয়া ইহার পেট খুব মোটা হয়। গরুর দেহ শক্ত ও পুরু **চামড়া** দিয়া ঢাকা। চামড়ার উপর মোটা ছোট-ছোট খস্‌খসে **লোম** থাকে।

মাথা—দেহের তুলনায় মাথা ছোট ; মাথার উপরি ভাগ প্রশস্ত ও সমতল। মাথার দুই পাশে দুইটি বড় **চোখ** আছে।
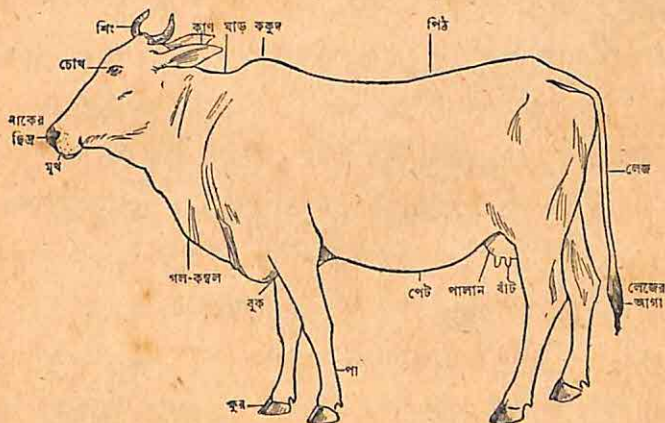
৯৬নং চিত্র—গাই গরু।

কপালের উপরে দুই পাশে দুইটি ফাঁপা ও গোল **শিং** আছে। বিভিন্ন গরুর শিংয়ের আকৃতি লক্ষ্য কর। গরু শিং দিয়া

গুতাইয়া আত্মরক্ষা করে। দুইটি শিংয়ের নীচে দুইটি মোচার খোলার মত বড় **কাণ** অবস্থিত। ইহাদের শ্রবণ-শক্তি প্রবল। কাণ খাড়া করিয়া গরু শব্দ শুনে। গরু কাণের ঝাপ্‌টা দিয়া চোখের উপরকার মশা-মাছি তাড়ায়। গরুর মুখের উপর দুইটি বড় **নাক** আছে। ইহার ঘ্রাণ-শক্তি তীব্র।

গলা—গরুর **গলা** বড়। গলায় একটি লম্বা ও চওড়া চামড়া ঝোলে, ইহাকে **গল-কম্বল** বলে। গরুর ঘাড়ে চর্ব্বিপূর্ণ একটি উঁচু অংশ থাকে ; ইহাকে **ককুদ্‌** বলে। ষাঁড়ের ককুদ্‌ খুব বড়। বিলাতী গরুর ককুদ্‌ নাই।

দাঁত—গরুর মুখে দুইটি **চোয়াল** আছে। উপরের চোয়ালের সামনে দাঁতের বদলে শক্ত **মাঢ়ী** আছে। নীচের চোয়ালের সামনে আটটি **ছেদক দাঁত** আছে ; নীচের দাঁতের উপর উপরের চোয়াল চাপিয়া ধরিয়া গরু ঘাস ছিঁড়িয়া খায়। প্রত্যেক চোয়ালের দুই পাশে ছয়টি করিয়া চব্বিশটি **পেষক** দাঁত আছে। গরু তৃণভোজী বলিয়া ইহার দাঁতগুলির গড়ন চর্ব্বণ ও পেষণ করিবার উপযোগী। গরুর মুখে একটি **জিভ্‌** আছে। জিভ্‌টি বড় ও পুরু এবং উপরিভাগ খস্‌খসে।

খাদ্য-পরিপাক প্রণালী—তোমরা গরুকে এক জায়গায় বসিয়া নিশ্চিন্তে মুখ নাড়িতে দেখিয়াছ। ইহাকে **জাবরকাটা** বা **রোমন্থন** করা বলে। গরু ভীরু জন্তু ; বনে জঙ্গলে ইহার শত্রু অনেক। সেইজন্য ইহা তাড়াতাড়ি ঘাস-পাতা ছিঁড়িয়া গিলিয়া ফেলে। উহার আমাশয় চারি কুঠরীতে বিভক্ত।

এই অচর্ব্বিত ঘাস-পাতা প্রথম কুঠরীতে জমা হয়। তারপর মৌচাকের মত দ্বিতীয় কুঠরীতে যাইয়া খাদ্য নরম ডেলায় পরিণত হয়। নিরাপদ স্থানে গরু এই ডেলা উগ্‌রাইয়া মুখে
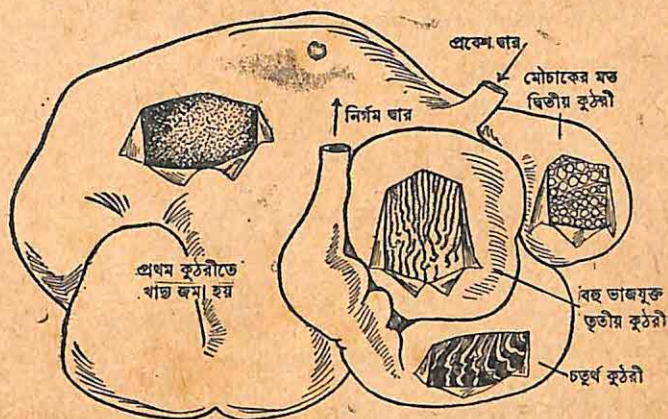
৯৭নং চিত্র—গরুর আমাশয়।

আনিয়া চিবাইতে থাকে। চর্ব্বিত নরম খাদ্য তৃতীয় ও পরে চতুর্থ কুঠরীতে যাইয়া হজম হয়।

লেজ—গরুর **লেজ** লম্বা ও সোজা। লেজের শেষে একগোছা রোম থাকে। গরু লেজ ঘুরাইয়া লোম দিয়া মশা-মাছি তাড়ায়।

পা—গরুর চারিটি লম্বা **পা** আছে। প্রত্যেক পায়ের পাতায় **খুর** আছে। খুর মাঝখানে চেরা ; গরুর পায়ে চারিটি আঙ্গুল। তৃতীয় ও চতুর্থ আঙ্গুলের নখ বড়, শক্ত ও পুরু হইয়া খুর হইয়াছে। খুরের পিছনে মাংসপিণ্ডের মত দুইটি ছোট

আঙ্গুল (১, ২—৯২নং চিত্র) আছে। চলিবার সময় ইহারা কোন কাজে লাগে না। গরু সামনের তুই খুরযুক্ত আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া চলে।

পালান—গাই গরুর বড় বড় **পালান** থাকে। পালানে
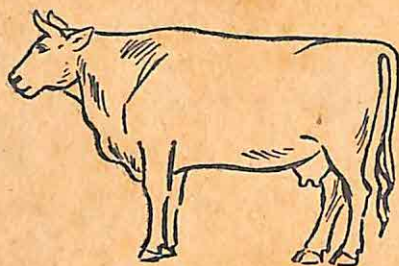
৯৮নং চিত্র—বিলাতী গরুর ককুদ্ নাই।

চারিটি **স্তন** বা **বাঁট** থাকে। প্রত্যেক স্তনের মুখে ছিদ্র থাকে। ছিদ্রের মধ্য দিয়া তুধ বাহির হয়।

উপকারীতা—গরুর মত মানুষের উপকারী জন্তু আর নাই। গরু তুধ দেয়, গাড়ী ও চাষের লাঙ্গল টানে। তুধ অতি পুষ্টিকর খাদ্য। মরা গরুর চামড়া, হাড়, শিং, খুর অনেক কাজে লাগে।

কুকুরের (মাংসভোজী) **ও গরুর** (তৃণভোজী) **তুলনা**ঃ—১। কুকুর চতুষ্পদ, মাংসাশী ও স্তন্যপায়ী। গরু চতুষ্পদ, তৃণভোজী ও স্তন্যপায়ী। ২। কুকুরের পেট ক্ষুদ্রাকার। গরুর পেট বৃহদাকার। ৩। কুকুর তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ও নখ দিয়া আঁচড়াইয়া আত্মরক্ষা করে। গরু শক্ত ও বড় শিং

দিয়া গুতাইয়া আত্মরক্ষা করে। ৪। কুকুরের আমাশয় ক্ষুদ্র ও সরল। গরুর আমাশয় বৃহৎ ও জটিল। ৫। কুকুর জাবর কাটে না। গরু জাবর কাটে। ৬। কুকুরের চোয়াল ছোট এবং উপর-নীচে উঠে বা নামে। গরুর চোয়াল লম্বা কিন্তু চওড়া নয়। নীচের চোয়াল ডাইনে বামে চলে। ৭। কুকুরের দুই পাটিতে সূচল ছেদন ও শ্ব-দন্ত থাকে। গরুর উপর পাটিতে ছেদন ও শ্ব-দন্ত থাকে না। কেবল নীচের পাটিতে ভোঁতা ছেদন দন্ত আছে। ৮। কুকুর আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া চলে। গরু শক্ত ও পুরু খুরের উপর ভর দিয়া চলে। ৯। কুকুরের লেজ মোটা ও রোমে ভরা। শিকার ধরিবার পূর্ব্বে লেজ ঘুরায়। গরুর লেজের প্রান্তে একগোছা রোম থাকে। লেজ দিয়া মশা-মাছি তাড়ায়। ১০। কুকুর একবারে ৪।৫টি বাচ্চা প্রসব করে। গরু সাধারণতঃ একবারে একটি বাচ্চা প্রসব করে।

প্রশ্ন

১। স্তন্যপায়ী কাহাকে বলে? ২। কুকুরের দেহ বর্ণনা কর। কুকুরের একটি ছবি আঁক। তৃণভোজী প্রাণীর দন্তবিন্যাসের বিশেষত্ব কি? (M. E. 1938). ৩। গরুর দেহ বর্ণনা কর। ইহার একটি ছবি আঁক। ৪। কুকুর ও গরুর দেহের পার্থক্য কি কি? রোমন্থন-ক্রিয়া কাহাকে বলে? গরুর পাকস্থলীর ভিতর ভুক্তদ্রব্য কি ভাবে জীর্ণ হয়? (M. E. 1939)।

সমাপ্ত